রূপান্তরের দুর্গমপথে

এরিক হফার

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

গ্রন্থকারের পরিচয়

সান্ ফ্রান্সিস্কোর বাসিন্দা এরিক হফার ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ডকমজুর হিসাবে কাজ ক'রে আসছেন। জায়গায় জায়গায় ঘুরে ক্ষেত-মজুরের কাজ এবং সোনার খনিতেও কাজ করেছেন। "নব পথিকৃৎ" দলেরও তিনি ছিলেন অন্যতম। নিজের চেষ্টায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন তিনি। নিজের প্রথম জীবন সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ আমার হয় নি। পনের বছর বয়স পর্যন্ত বস্তুতঃ আমি ছিলাম অন্ধ। যখন আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলাম, তখন ছাপার অক্ষরের জন্য আমি অনুভব করলাম একটা প্রচণ্ড বুভুক্ষা।" বর্তমান জীবনধারা তিনি বেছে নিলেন এই কারণে যে, কারখানায় কাজ করা তাঁরা পছন্দ-সই ছিল না। কোনো মনিবের তাঁবেদারি করাটা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাই, নিউইয়র্ক থেকে বেরিয়ে যেতে তিনি কৃতসংকল্প হলেন। নিজেব মনের যুক্তিই তাঁকে বলে দিল, যে লোক গরীব থাকতে চায় ক্যালিফোর্নিয়াই হচ্ছে তাঁর দেশ।

আর্থনীতিক মন্দার সময়ে পুরো দশ বছর তিনি যাযাবর শ্রমজীবী হিসাবে কাটিয়েছিলেন ওকলাহোমা ও আরকানজাস্ রাজ্যের তদানীন্তন কালের দরিদ্র দিনমজুরদের মধ্যে। সেই সময়েই তিনি গণ আন্দোলনের মত বিস্ময়কর ব্যাপার সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বিষয় সূচী

রূপান্তরের দুর্গম পথে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন

নতুনকে কেউই পছন্দ করে না, এ আমার বদ্ধমূল ধারণা। আমরা নতুনকে ভয় পাই। ডস্টয়েভস্কির মতে 'আমরা নতুন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অথবা নতুন কোন কথা বলতে রীতিমত ভীত হই।' এমন কি সামান্য ব্যাপারেও নতুনের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে আশঙ্কার বিষয় হয়ে পড়ে। ক্বচিৎ ভাবী অমঙ্গলের পূর্বাভাস বর্জিত হয়ে থাকে।

১৯৩৬ সালের কথা বলি। বছরের অধিকাংশ সময়ই আমার কেটেছিল ক্ষেত থেকে মটরশুঁটি সংগ্রহ করার কাজে। জানুয়ারী মাসের প্রথমদিকে ইম্পীরিয়্যাল ভ্যালীতে কাজ শুরু করে ক্রমে উত্তর দিকে এগোতে লাগলাম। শুঁটিগুলি যেমন যেমন পেকে উঠল, আমিও ক্রমান্বয়ে তাদের ক্ষেত থেকে তুলতে তুলতে এগোতে লাগলাম। জুন মাস নাগাদ শুঁটি তোলার কাজ করতে করতে ট্র্যাসির কাছাকাছি পৌছুলাম। বছরের শেষ মটরশুঁটি তুললাম ট্র্যাসির কাছাকাছি। তার পরের কর্মক্ষেত্র হোল লেক কাউন্টি। সেখানে সেই সর্বপ্রথম গেলাম বরবটী তোলার কাজে। আমার মনে আছে বরবটী তোলার কাজে লাগবার সময় সেই প্রথম প্রভাতের দ্বিধা-সংশয়ের কথা। আমি কি ঠিকমতো বরবটী তোলার কাজ করতে পারবো? এ সংশয় আমার মনে এসেছিল। শুঁটি সংগ্রহ থেকে বরবটী তোলার কাজ—এই সামান্য পরিবর্তনের মধ্যেও আশঙ্কার ছায়াপাত।

বৈপ্লবিক বা আমূল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই অস্বস্তিটা গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। যা সম্পূর্ণ নূতন তার জন্য আমরা কখনই পুরোপুরি তৈরী হয়ে উঠতে পারি না। নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া দরকার; কিন্তু প্রত্যেক মূলগত পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে গেলে আত্মাদরে সংকট দেখা দেয়। আমাদের সম্মুখে যে পরীক্ষা দেখা দেয়, সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া খুব সহজ-সাধ্য হয় না। উত্তীর্ণ হতে হলে আমাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। নিষ্কম্প হৃদয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হওয়া যায় যদি আমরা আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী হই।

এই যে আমরা সম্পূর্ণ নতুনকে মনে প্রাণে কখনই গ্রহণ করতে পারি না, এর ফলে কতকগুলি অদ্ভুত সমস্যার উদ্ভব হয়। কথাটা হচ্ছে এই যে, যে দেশের মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, সে দেশের মানুষেরা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে থাকে। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ও আবেগ প্রবণতার মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। কাযতঃ আবেগ প্রবণতার তীব্রতা প্রগাঢ়তা আত্মপ্রত্যয়ের অভাবকে অনেক সময়ে পূরণ করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই সত্যটুকু পরিলক্ষিত হয়। আপন শক্তিতে আস্থাবান কুশলী শ্রমিক ধীরে সুস্থে নিজের কাজ করে। কাজ যেন তার কাছে খেলা। আর পক্ষান্তরে যে নতুন কাজে লেগেছে সেই অনভিজ্ঞ শ্রমজীবী প্রচণ্ড উৎসাহে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েঃ ভাবটা যেন এই কাজটুকু ক'রে সে পৃথিবীকে আসন্ন প্রলয় থেকে রক্ষা করছে। অবশ্য যদি তার কাছ থেকে কিছুমাত্র কাজ পাবার আশা আমরা করি তাহলে এইভাবেই তাকে কাজ করতে দিতে হবে। এই অনভিজ্ঞ কারিগর বা শ্রমজীবীর ক্ষেত্রে যা সত্য তা সৈনিকদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। প্রচণ্ড আবেগের দ্বারা বিচলিত না হয়েও দক্ষ সৈনিক অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারে। তার মনোবল অক্ষুণ্ন থাকে কারণ তার পূর্ণাঙ্গ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা তাকে প্রয়োজনীয় আত্মপ্রত্যয়টুকু দেয়। কিন্তু যে সৈনিক এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, উৎসাহ আবেগ আর গভীর বিশ্বাসে উদ্দীপিত না হয়ে উঠলে সে যুদ্ধক্ষেত্রে ভালো ফল দেখাতে পারে না। ক্রমওয়েল বলতেন যে সাধারণ মানুষকে সৈনিকের বীর্যবত্তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়াতে হলে তাদের সামনে ভগবদ্‌ভীতির জুজু উপস্থাপিত করতে হবে। কর্মকুশলতা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্জাত আত্মপ্রত্যয়ের অভাবের বিকল্প হোল মানুষের মধ্যে বিশ্বাস, উৎসাহ এবং আবেগের তীব্রতার প্রাচুর্য। পর্বত অপসারণের কৌশলটুকু যদি আমাদের আয়ত্তে থাকে, তা হলে যে অন্ধ বিশ্বাস পর্বতও অপসারিত করতে পারে বলে মনে করে তা আমাদের না থাকলেও চলে। অর্থাৎ কৌশল অনায়ত্ত হলে তবেই এই ধরনের অন্ধ বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়।

আমরা পূর্বেই বলেছি, যে দেশের জনসমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে সে দেশের মানুষেরা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। তাদের মানুষদের মনে ভারসাম্যের প্রাগাভাব থাকে। তারা কাজ-পাগলা

হয়; তাদের আবেগে বিস্ফোরণ সম্ভাবনা অতি মাত্রায় প্রকট। আমরা কাজের মধ্য দিয়ে অপরের আস্থাভাজন হই; আমাদের যোগ্যতার যাচাই হয় কাজের মধ্য দিয়েই। যখন আমরা মানসিক ভারসাম্য হারাই, তখনই আমরা কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যে মানুষ ভারসাম্যটুকু হারিয়ে ফেলেছে, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল নতুন নতুন কাজে আত্মনিয়োগ করা। যেমন নিমজ্জমান ব্যক্তি হাত-পা ছুঁড়ে আপন দেহের ভারসাম্য কোন রকমে বজায় রেখে নিজেকে ভাসিয়ে রাখে, ঠিক তেমনি যে মানুষ মানসিক ভারসাম্যটুকু হারিয়ে ফেলেছে সে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরন্তর কাজ করে চলে। তাই বলছিলাম যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, আমূল পরিবর্তন মানুষের রুদ্ধ কর্মশক্তিকে মুক্তি দেয়; তবে এই শক্তিটুকুকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে তাকে সমর্থ করে তোলার জন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন হয়। সেই পরিবেশে মানুষের আত্মোন্নতির প্রচুর সুযোগ থাকা দরকার আর দরকার মানুষের মনে সুগভীর আত্মপ্রত্যয়ের। এই দুটির যদি অভাব না থাকে, তবে যে দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে, সে দেশের মানুষেরা বৃহৎ এবং মহৎ কর্মসম্পাদনে সক্ষম হবে। নিরন্তর কর্মযজ্ঞে সে দেশের মানুষেরা আপন আপন সার্থকতার পথ খুঁজে পাবে।

আত্মক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসানে আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এসে উপস্থিত হোল; তারা বসবাস করতে চাইল এই নতুন মহাদেশে। তাদের চোখেমুখে পালাবদলের নিশানা। এই যে আমূল পরিবর্তন—এর আবির্ভাব হয় বেদনাপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। সম্পূর্ণ অপরিচিত জগৎ; নতুন মহাদেশের হিমশীতল ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একান্ত নিঃসঙ্গতা। পিছনে ফেলে আসা ইউরোপের কোন একটি ছোট্ট গ্রাম বা শহরের সেই গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব, দলগত সামাজিক উষ্ণ পরিবেশ এখানে নেই। নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া খুব সহজ ছিল না। তাই তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হওয়া সহজ ছিল। নতুন বিরাট মহাদেশে আত্ম-সংস্কারের, আত্মোন্নতি সাধনের অনন্ত সুযোগ সুবিধা। এই নতুন দেশের অপরিচিত পরিবেশে আত্মপ্রত্যয় ও কর্মসাধনে তৎপরতা—উদ্যম ও সাহস এই নবাগতদের মনে বাসা বাঁধবার সুযোগ পেয়েছিল। কাজেই ইউরোপের ছোট ছোট শহর এবং গ্রাম থেকে আগত ঔপনিবেশিকরা

ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলো নতুন নতুন কর্মোন্মাদনায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা নতুন মহাদেশের বন্য দুর্দম প্রকৃতিকে শান্ত ও বশীভূত করে ফেলল। আজও আমরা সেই প্রচণ্ড কর্মোন্মাদনার প্রতিক্রিয়া অনুভব করছি।

এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে মানুষ যদি আত্মসম্প্রসারণের যথাযথ সুযোগ না পায়, তাদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা বোধ যদি কর্মের মধ্যে সার্থক না হয়ে ওঠে, তবে একটি বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে মানুষের আত্মপ্রত্যয় ফিরে পাবার তাড়না, নবতর মূল্যবোধের সন্ধান এবং ভারসাম্যের অভাব নতুন নতুন বিকল্প সমাধান খুঁজে বেড়ায়। আত্মপ্রত্যয়ের পরিবর্তে আসে বিশ্বাস, আত্মমর্যাদার বিকল্প হয় অহংবোধ এবং জীবনে মানসিক ভারসাম্যের স্থলে দেখা দেয় যূথ-বদ্ধতা-প্রীতি।

এই সত্যটুকু অনস্বীকার্য যে বিকল্প সমাধান গ্রহণের অর্থই হোল অশান্তি ভোগ করা। মানুষের মানস-রসায়নে যে কোন বিকল্প সমাধানই বিস্ফোরণ ঘটায় কেন না বিকল্প সমাধান অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সীমায়িত; তা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সবটুকু মেটাতে পারে না। যা আমরা মনেপ্রাণে চাই না, তার প্রাচুর্যও কখনই দীর্ঘদিন আমাদের অভিজ্ঞতায় বিধৃত হয়ে থাকতে পারে না। আমরা হতে চাই আত্মপ্রত্যয়শীল, আমরা নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে চাই। এগুলির বিনিময়ে আমরা কোন বিকল্প মেকী বস্তু নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে চাই না। অবশ্য সাধারণভাবে নিজের শক্তিতে আস্থাবান হয়ে নিজের প্রতি সম্ভ্রম পোষণ করতে পারলে কাজ চলে যায়; আমাদেরও অসন্তোষের বিশেষ কারণ থাকে না। কিন্তু যে মহৎ কর্ম সম্পাদনে আমরা অগ্রণী হব তার অলৌকিক পবিত্রতায় আমাদের সীমাহীন, সুগভীর আস্থা থাকা দরকার। আমাদের জাতি, গোষ্ঠী, নেতা ও দল— এদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমাদের কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করতে হয়। তাই এদের সঙ্গে একাত্মানুভূতিজনিত যে গর্ববোধ আমাদের মনে জাগ্রত হয় তা চরম এবং উদগ্র। প্রান্তিক আবেগ প্রবণতা স্বভাবতঃই এই কর্মীদলকে উদগ্র করে তোলে। কেননা এই বিকল্প সমাধান কখনই আমাদের সমগ্র চরিত্রসত্তার অঙ্গীভূত হয়ে উঠতে পারে না।

সংক্ষিপ্তসার—যে জনসমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, তাদের মধ্যে

আত্মোন্নতি সাধনের ও ব্যক্তিগতভাবে কাজ করবার যথেষ্ট সুযোগ থাকা দরকার। যদি তা না থাকে, তবে এই পরিবর্তনোন্মুখ মানুষেরা বিশ্বাসকে, অহংবোধকে এবং একতাকে তাদের অবলম্বন হিসাবে একান্ত আগ্রহে গ্রহণ করে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে সমষ্টিগত কর্মোদ্যমে তারা অধিক পরিমাণে আস্থাশীল হয় এবং এই যৌথ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য, 'পৃথিবীকে দেখিয়ে দেওয়া'। অন্য কথায় আমরা বলতে পারি যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমাজে আমূল পরিবর্তনটুকু মানুষের মনে গোঁড়ামি, সম্মিলিত সক্রিয়তা এনে দেয়। তারা বিধিসম্মত রীতিপদ্ধতির প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে। যূথবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টায় তারা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। ক্রমে ক্রমে এক বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমরা শুনেছি যে বিপ্লবের পথেই সমাজের সম্পূর্ণ পরিবর্তনটুকু সাধন করা সম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তবপক্ষে আমূল পরিবর্তনই বিপ্লবের অগ্রদূত। বৈপ্লবিক মনোভাব জন্ম নেয় তখনই যখন মানুষের পরিবেশে আমূল পরিবর্তন সংসাধিত হয়। তাদের নানা অসুবিধা; তাদের অভাবজনিত বিরক্তিবোধ, তাদের ক্ষুধা, তাদের বিফলতা, তাদের এই বেদনাদায়ক পরিবেশ—এরাই তাদের মনে এই বিপ্লব প্রবণতাকে উদ্বুদ্ধ করে এই বিপ্লব সম্ভাবনাকে সত্য করে তোলে। যেখানে পরিবেশের কোন পরিবর্তন ঘটে নি, সেদেশে বিপ্লবের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এশিয়ার নবজাগরণ

এশিয়ার সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক অশান্তির কারণ হিসেবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ এই অশান্তির মূল কারণ হিসেবে বিদেশী প্রভুত্ব অথবা স্থানীয় সরকারের দুর্নীতিপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। যদিও এই ধরনের ব্যাখ্যায় আংশিক সত্য অনুস্যূত। কিন্তু এরা সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করেনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি বারবার বিজিত হয়েছে; বিজয়ীর লোভ বিজিতের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছে; কুশাসনের বিশৃঙ্খলায় রাষ্ট্রগুলি হৃতসর্বস্ব হ'য়ে গেছে। স্বদেশী এবং বিদেশী শাসনের অত্যাচারে তাদের দুঃখের পাত্রটি বারংবার পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। আজ যদি এশিয়ায় গণ-অভ্যুত্থান হ'য়ে থাকে, তা হ'লে সেই অভ্যুত্থান শাসকের অপরিমিত অত্যাচার ও অসদাচারের জন্যই ঘটেছে, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ ঘটবে। এর কারণ হল অতীতে জন-সমাজ যা ছিল, আজ ঠিক তা আর নেই। তাদের মেজাজের বদ্‌ল হয়েছে এবং এই মেজাজ-বদলের পিছনে রয়েছে এক ধরনের বাস্তব সত্য। আমরা শুনেছি যে এশিয়ায় নবজাগরণ এসেছে। কিন্তু এই নবজাগরণকে যদি শুধুমাত্র আলংকারিক অর্থে গ্রহণ না করি তা হলে আমাদের বুঝতে হবে যে এশিয়ার মানুষের মনে তার মানস-প্রবণতায়, তার আশা-আকাঙ্ক্ষায়, তার দৃষ্টিভঙ্গীতে কী ধরণের পরিবর্তন ঘটল? কেমন করে কোন পথে এই পরিবর্তন সাধিত হল?

এ কথা কমিউনিস্ট অন্দোলন সম্বন্ধেও একইভাবে প্রযোজ্য। কমিউনিস্টদের প্রচারের জন্যই এই আন্দোলন সফল হচ্ছে, একথা ভাবলে ভুল হবে। যাদের মধ্যে প্রচার কার্য চালানো হচ্ছে, তাদের মতিগতি, তাদের মনোভাব এই আন্দোলনের সাফল্যের কারণ। যখন কমিউনিস্ট প্রচার বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয় না, তখন তারা সেই কথাই প্রচার করে যা তদ্দেশীয় জন-সাধারণ বিশ্বাস করতে চায়। যাদের মধ্যে প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে, তারা

মরিয়া হয়ে যা চায় সেটুকু দিলেই প্রচারকার্য সফল হয়। এশিয়ার সাম্প্রতিক অবস্থার বিশ্লেষণ এবং সমীক্ষণ করা সম্ভব হবে না যদি না আমরা তদ্দেশীয় ব্যষ্টি মানসের গতিপ্রকৃতির, তাদের মানসপ্রবণতার ও আশা-আকাঙ্ক্ষার খবর রাখি। চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার অনশনক্লিষ্ট ও অর্ধনগ্ন পর্ণকুটীরবাসী মানুষেরা কী চায় তার খবর আমাদের রাখতে হবে।

আর্থনীতিক তত্ত্বকথা আমাদের যে সমাধান দেয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়। ছবিতে দেখা চলন্ত জনতার মুখচ্ছবি মনে পড়ে যায়; অগণিত উর্ধ্বমুখী মুখের শোভাযাত্রায় কত রকম মুখভঙ্গী তাদের, মুখের মুকুরে কত শত ভাবের প্রতিচ্ছায়া! কেউ মুখ বুজে নেই; মুখব্যাদান ক'রে তারা কী যেন বলছে? তাদের মনের ভাব জানবার জন্য কৌতূহল হয়। তারা কী আশ্রয়ের জন্য, অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য চেঁচাচ্ছে? জীবনে যা কিছু শ্রেয় তার জন্যই কী তারা চীৎকার করছে? তারা কী স্বাধীনতা চাচ্ছে, তারা কী ন্যায় বিচার প্রার্থনা করছে? না, তা নয়। তাদের এই উত্তাল কলরবের পিছনে রয়েছে তাদের অহংকার। এই অহংবোধটুকুকে তৃপ্ত করার জন্য এশিয়ার মানুষেরা তাদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারে; আর্থনীতিক সুযোগ সুবিধা ত তুচ্ছ কথা। ওরা চীৎকার করে ওদের বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, আর্থনীতিক অসুবিধা বা দাবীদাওয়ার কথা ওরা বলছে না। আমরা ক্রমে দেখতে পাব যে গণজাগরণের প্রকাশ ঘটছে এই অহংবোধের সরব প্রতিষ্ঠা প্রয়াসে। এই গণজাগরণের পর্যায়ক্রমটুকু বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সমস্যাটির কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করতে পারব।

এশিয়ায় নবজাগরণের মুখ্য হেতু হল পশ্চিমের প্রভাব—এর অর্থ এই নয় যে প্রতীচ্যের উপনিবেশস্থাপনকারী রাষ্ট্রগুলির অত্যাচার ও শোষণের ফলেই এই জাগরণ সম্ভব হয়েছে। কেননা অত্যাচার ও শোষণের সঙ্গে এশীয় জনগণের বহুকালের পরিচয়; ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসন, অথবা ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ শাসন যে তৎতদ্দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছে, এ কথা অনস্বীকার্য। ইংরেজ অথবা ওলন্দাজ শাসনের ফলে যে উপকার তৎতদ্দেশীয় জনগণ পেয়েছেন তা পূর্বেকার কোন শাসন-ব্যবস্থায় তাঁরা পাননি; ভবিষ্যতে তা পাবার আশা খুব বেশী আছে ব'লে মনে হয় না। আমি বিশ্বাস করি যে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি যদি আরো শতগুণ বেশী কল্যাণ সাধন করতেন, যদি

তাঁরা গোড়া থেকেই জনহিতের মহত্তর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশশাসন করতেন, তাহলেও তাঁদের এই ধরনের শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হতে হ'ত। পশ্চিমী শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তাঁদের প্রভাবে উপনিবেশগুলিতে এক ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই পরিবর্তনই এশিয়ার সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক অশান্তির মূলে রয়েছে।

আমি যে পরিবর্তনের কথা ভাবছি, তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তা গোষ্ঠীগত কাঠামোয় ভাঙ্গন ধরায়, তাকে দুর্বল করে। পশ্চিমী প্রভাব আসার আগে এশিয়ার সর্বত্রই জনগণ ছোট ছোট সুসম্বদ্ধ গোষ্ঠীতে যূথবদ্ধ ছিল। এই গোষ্ঠী কোথাও পিতৃ-প্রধান সুবৃহৎ পরিবার, গোষ্ঠী অথবা উপজাতির আকার নিয়েছিল; কোথাও বা সুসম্বদ্ধ গ্রামীন অথবা নাগরিক গোষ্ঠী-রূপে, আবার কোথাও বা ধর্মীয় সম্প্রদায় অথবা রাষ্ট্রনৈতিক দল হিসেবে তা আত্মপ্রকাশ করেছিল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যষ্টি সকল সময়ে অনুভব করেছে যে সে এক প্রবাহমান আদি-অন্তহীন সমগ্রতার মধ্যে বিধৃত। সেই ব্যক্তিমানুষ কখনো আপনাকে নিঃসঙ্গ বোধ করেনি, সে কখনো আপনাকে হারিয়ে ফেলেনি। অনন্ত মহাশূন্যে ভাসমান জীবন-বিন্দু হিসেবে সে কখনো নিজেকে ভাবতে পারেনি। পশ্চিমী প্রভাব এই সামগ্রিক অস্তিত্ববোধকে দুর্বল করতে চেয়েছে, ধ্বংস ক'রে দিতে চেয়েছে এই যূথবদ্ধতাকে। গতানুগতিক জীবনধারায় ভাঙ্গন ধরল, ক্ষয়ে গেল ধীরে ধীরে এই চিরায়তের অচলায়তন; সমষ্টিগত সম্প্রদায়গত অস্তিত্বের কাঠামো থেকে তাঁর গৌরবের জলুসটুকু মুছে নিল; তারা পশ্চিমী সভ্যতার চাপে ক্রমে ক্রমে অকেজো হয়ে পড়ল। নতুন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন প্রণয়ন, শিক্ষা-বিস্তার, কলকারখানার প্রসার এবং সর্বোপরি জলন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে পশ্চিমী সভ্যতা এটুকু সম্পন্ন করল। পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রজাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা দিল। প্রাচ্যের মানুষেরা যাতে সব রকমের আলস্য ত্যাগ ক'রে তাদের শিলীভূত ঐতিহ্য-প্রিয়তাকে পরিহার ক'রে আত্মোন্নতির পথ খোঁজে, পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠী তা চাইল। এর ফলে ব্যক্তি-মানুষের মুক্তি ঘটল না কিন্তু তারা ক্রমে নিঃসঙ্গ এবং যূথভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। বাইরের প্রভাব তাদের উপর কাজ করতে লাগল। এতোদিন যে নাবালক মানুষটি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের উষ্ণতা এবং নিরাপত্তায় আরামে দিন কাটাচ্ছিল, তাকে হঠাৎ এক নিরুত্তাপ জগতে অভিভাবকহীন

রিক্ত অবস্থায় দিন কাটাতে হল। এই গোষ্ঠী থেকে আকস্মিক বিচ্যুতির যে বেদনা, পরিত্যক্ত হওয়ার যে ব্যথা তা-ই এশিয়ার গণ জাগরণের সূচনা করল। সমাজ বিবর্তন পথে এই গোষ্ঠীজীবনের ভেঙ্গে পড়া, এটা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এক্ষেত্রে ব্যক্তি-মানুষকে সম্পূর্ণরূপে আপন বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করতে হয়। এই যে ব্যক্তি-মানুষ, যার নতুন অভ্যুদয় ঘটল, সে কিছুটা পরিমাণে স্বস্থ হয়ে ওঠে তখনই যখন সে আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আপনার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রচুর সুযোগ পায়। ক্রমে সে আপনার দৈনন্দিন জীবনের সকল ভার বহনে এবং চাপ সহ্য করায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সে এমন একটি পারিপার্শ্বিক চায় যেখানে সে কাজ করতে পারে, কাজে সফলতা অর্জন করতে পারে, এবং এই কাজের ফলে আপনার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে। আপন প্রতিভার বিকাশ সে এই কাজের পথেই ঘটাতে চায়। এই ভাবে আত্মপ্রত্যয়টুকু ফিরে পায়, আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এই আত্মবিশ্বাস ও নিজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে তবেই মানুষের জীবনধারণ অর্থহীন হয় না। মানুষ বাঁচার মধ্য দিয়ে আনন্দ খুঁজে পায়।

যেখানে এই আত্মবিশ্বাসের, এই নিজের প্রতি শ্রদ্ধার অসদ্ভাব ঘটে, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি-মানুষের বিস্ফোরণধর্মী হওয়ার সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেড়ে যায়। সে তখন কোন এক সার্বভৌম সত্যকে আশ্রয় করতে চায় অথবা কোন এক রাষ্ট্রনেতার চটকদার ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আপনার হারানো আত্মবিশ্বাসটুকুকে, আপন মূল্যবোধটুকুকে ফিরে পেতে চায়। কখন কখন সে এই রাষ্ট্রনেতার বদলে কোন একটি গোষ্ঠীর, দলের জাতির অথবা গণ-আন্দোলনের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে যেতে চায় ঐ একই কারণে। সে এবং তার সমধর্মী মানুষেরা সমাজ-বিপ্লবে সহায়তা করে। এই বিপ্লব সমাজের ভিত্তি-ভূমিতে আঘাত করে; এর ফলে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয়। অবস্থার বিরল যোগাযোগে হয়ত কখনো বা মানুষের এই গোষ্ঠী-আশ্রয়ী অস্তিত্ব থেকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অস্তিত্বে রূপান্তর ঘটবার সময় কোন মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু এই ধরনের যোগাযোগ বড একটা ঘটে না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে ইউরোপে আমরা দেখেছি ব্যক্তি-মানুষ এইভাবে গির্জার সামগ্রিক প্রভাব থেকে মুক্তি পাচ্ছে। প্রথমটা এই মুক্তি ঘটল আকস্মিকভাবে। দুর্বল এবং অবমানিত পাদ্রী সমাজ ইউরোপের মানুষের

মন থেকে এবং হৃদয় থেকে নির্বাসিত হল, তার আর কোন কর্তৃত্ব রইল না। সেক্ষেত্রেও ব্যক্তি-মুক্তি সম্ভব হল এই বর্জনের ফলেই ; মুক্তির জন্য সজ্ঞান প্রয়াস এই মুক্তিটুকুকে সম্ভব করে নি। কিন্তু আজকের দিনের এশিয়ার নব জাগরণ যে অবস্থায় ঘটছে, সেই অবস্থা ইউরোপে সেদিন ছিল না। মধ্যযুগ যখন অবসান হল, তখনকার ইউরোপীয় মানুষেরা জেগে উঠে দেখল, তাদের সামনে রয়েছে সদ্য-আবিষ্কৃত নতুন নতুন মহাদেশের ইশারা, নতুন নতুন বাণিজ্যপথের আমন্ত্রণ আর নব নব সাম্রাজ্যস্থাপনের সম্ভাবনা। কাগজের ব্যবহার বিধি প্রবর্তনে ও ছাপাখানার আবিষ্কার ও প্রবর্তনে এবং ছাপাখানার উদ্ভাবনে জ্ঞানের নূতন দিগন্তও তখন তাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আকাশে বাতাসে আলার বাণী তখন অনুরণিত হচ্ছে, ওদেশে তখন একটা আত্ম-প্রত্যয়ের ঢেউ লেগেছিল। ওদেশের মানুষ বিশ্বাস করল যে তারা আপন প্রতিভা ও শক্তি বলে এবং সুপ্রসন্ন ভাগ্যের আনুকূল্যে যে কোন কর্ম সম্পন্ন করে তুলতে পারে। তাদের কর্মশক্তি স্বদেশে ও বিদেশে কোথাও বাধা পেয়ে ব্যর্থ হবে না।

অনুকুল অবস্থার যোগাযোগে পশ্চিমে মানুষের গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব থেকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অস্তিত্বে যখন রূপান্তর ঘটল তখন তাদের প্রাণশক্তির এক দুর্বার সমারোহ আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এমনটি আর অন্য কোন দেশের সভ্যতায় দেখিনি। তবুও এই রূপান্তরটুকুকে একেবারে নিরুপদ্রব বলতে পারি না। সংস্কারসাধন ও প্রতিসংস্কারসাধন (Reformation and Counter-Reformation) আন্দোলনের অনুষঙ্গী উপদ্রব এবং গণ্ডগোলের সূত্রপাত হল মানুষের ভয় থেকে। এই ভয়ের মূল হল ব্যক্তি মানসে আপন আপন দায়িত্ব পালনের শক্তি সম্বন্ধে সংশয়ের উদ্রেক।

এশিয়ার মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ-জীবনে যখন ভাঙ্গন ধরল, তখন অনুকুল অবস্থার যোগাযোগে এই ধরনের কোন অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। কত শত শতাব্দীর ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর এশিয়ার মানুষের এই জাগরণটুকু ঘটল। তার সামনে কোন অসামান্য সুযোগ-সুবিধার রঙিন স্বপ্ন ছিল না, মহৎ আলোর সংকেতে উদ্বেলিতচিত্ত হয়ে ওঠার তার কোন অবকাশও ছিল না। তার চারপাশের জীবন যেন কর্দমপূর্ণ বদ্ধ জলাশয় ; প্রাচুর্যের কোন ইঙ্গিত কোথাও নেই। শুধু অসংখ্য মানুষের

মেলা সেখানে, তার যেন কোন মূল্য নেই। এক টুকরো রুটি, সামান্য একটু পুরস্কার—তাই পাবার জন্য লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত লোলুপদৃষ্টি মানুষেরা হাত বাড়ায়। সেখানে শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই। সামান্য লেখাপড়া জানা মানুষেরা সেদেশে সম্মান পায়, মেহনতী মানুষ থেকে এরা নিজেদের স্বতন্ত্র মনে ক'রে। মুষ্টিমেয় গর্বান্ধ মানুষেরা পৃথিবীর কোন হিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করে আপনার মূল্য এ সমাজের পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তাটুকু যাচাই করে নিতে পারে না। তারা শুধুমাত্র বাক্‌সর্বস্ব, অভিনয়নিপুণ পণ্ডিতম্মন্য মানুষে পরিণত হয়।

নব্য এশিয়ার চরমপন্থী মানুষেরা কিছুটা শিক্ষিত; এঁরা কায়িক পরিশ্রমকে ভয় করে। যে সমাজব্যবস্থায় এঁদের নেতৃত্ব স্বীকৃত নয়, তাকে এঁরা ভয়ানক ঘৃণা করেন। প্রতিটি ছাত্র, করণের নিম্নতর শ্রেণীর প্রতিটি করণিক, চাকুরিজীবী প্রত্যেকটি পদাধিকারী এরা নিজেদের সবাই কেউ কেটা ভাবেন। এই বাকপটু, অকেজো মানুষেরা এশিয়ার আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করেন। এঁদের জীবন রক্ষা ব্যর্থ, এঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব, এঁদের আত্মমর্যাদাবোধটুকুও অবলুপ্ত। স্বীকৃতি ও মর্যাদালাভের মরীচিকার পিছনে এঁরা ছুটছেন। অহং বোধ এবং বিশ্বাসের বিকল্প এঁদের লক্ষ্য।

কমিউনিস্ট রাশিয়া মুখ্যতঃ এই সব মেকী বুদ্ধিজীবীর কাছে তারা আবেদন পাঠায়। কর্তৃত্বশালী বিদগ্ধ শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এঁদের স্থান করে দেবার প্রলোভন দেখানো হয়। ঐতিহাসিক সমাজ বিবর্তনে এঁদের ভূমিকা থাকবে, এই কথা বলে রাশিয়ার প্রচার কার্য এঁদের বিভ্রান্ত করে এঁদের ওপর একধরনের গুরুত্ব আরোপ করে। এদের তত্বঘেঁষা দ্ব্যর্থবোধক প্রচারে এই নেতৃত্বলোভী মানুষেরা সহজেই প্রতারিত হয়।

অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে প্রচার কার্য চালানো হয় তার মধ্যে আসল আবেদন কিন্তু এর প্রকৃত ও স্বীকৃত সত্য এবং তথ্যগুলির মধ্যে নয়। এই প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা হয় যে তারা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একযোগে এক অভুতপূর্ব সর্বপ্লাবী বিপ্লব ঘটাতে চলেছে। এই বিপ্লবের ফলে এক স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয় ঘটবে, যার ফলে বর্তমান জীবনের সব কিছুই নস্যাৎ হয়ে যাবে।

এশিয়ার এই গণজাগরণ সম্বন্ধে সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তত্ব হল এই যে

এশিয়াবাসীরা কোন নতুন শক্তি অর্জন করে এই গণজাগরণকে সম্ভব ক'রে তোলেনি। তাদের নৈতিক, মানসিক অথবা আধিভৌতিক কোন শক্তিই তারা বাড়াতে পারেনি। এই ধরনের কোন শক্তিরই আকস্মিক বিস্তার অথবা ক্রমান্বিত প্রসার তারা ঘটাতে পারেনি। এই গণাজাগরণটুকু সম্ভব হল পরিত্যক্ত হওয়ার বোধ থেকে; জীবন ও জগতের সঙ্গে মুখোমুখি বোঝাপড়া করতে হবে এই অনুভূতি থেকেই এই গণজাগরণ জন্ম নিল। আত্ম-দৌর্বল্যের তীব্র অনুভূতি এই জাগরণের সহায়তা করল। নব জাগ্রত এশিয়ার মানুষের মনের গতিপ্রকৃতি বুঝতে হ'লে দুর্বল মানুষের মনের কথা, তার সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতির কথাটুকু আমাদের বুঝতে হবে।

এ কথা প্রায়শঃই বলা হয়ে থাকে যে শক্তিই দুর্নীতির উৎস। কিন্তু এ কথাও অবিসংবাদিত সত্য যে দুর্বলতা মানুষকে নীতিহীন করে তোলে। শক্তি মুষ্টিমেয় শক্তিমান মানুষকে দুর্নীতি পরায়ণ করে তোলে। দুর্বলতা অসংখ্য দুর্বল মানুষকে নীতি ভ্রষ্ট করে। ঘৃণা, বিদ্বেষ, রূঢ়তা, পরমঅসহিষ্ণুতা ও সংশয়—এরা হল দুর্বলতার ফল। দুর্বলের প্রতিবাদ যে তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার থেকে উদ্ভূত হয় তা নয়; দুর্বল মানুষ সব সময়ে আপনাকে অসহায় এবং নিজেকে প্রতিকূল পরিবেশের অনুপযুক্ত মনে করেন বলেই এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। আমাদের প্রাচুর্য্যের ভাগ দিয়ে ঐ দুর্বল মানুষগুলোকে জয় করা যাবেনা। তারা আমাদের উদারতাকে অত্যাচার বলে গ্রহণ করবে। সেণ্ট ভিনসেণ্ট দ্য পল তাঁর শিষ্যদের এই জন্যই সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছিলেন: 'তোমরা গরীব মানুষদের যে রুটি দিচ্ছ, তার জন্য তাদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করতে হবে।' কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীটুকু কেবল সেখানেই সম্ভব হবে যেক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার মনে একই ভগবদ্ চেতনা বিরাজ করে। যেক্ষেত্রে উভয়েই ভগবানকে বিশ্বচরাচরের পিতারূপে গণ্য করে, উভয়েই ধর্মের ভাষাটুকু পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছে। এযুগে এই ধরনের আয়ত্তী-করণ হয়ত পরিপূর্ণরূপে সম্ভব নয়। আর ঐ দুর্বল মানুষ গুলোর সঙ্গে আমরা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের অহংকার অথবা ঘৃণাটুকুও ভাগ করে নিতে পারি না। পার্থিব ঐশ্বর্যে আমরা ওদের চেয়ে অনেক বেশী ঐশ্বর্যবান, ইতিহাসের অভিজ্ঞতার বিচারে আমরা ওদের থেকে ভিন্ন, তাই আমাদের উভয়ের সমীকরণ সম্ভব নয়। ওদের স্বনির্ভর হবার

জন্য আমাদের সাহায্য করা দরকার। আমাদের কারিগরী জ্ঞান, সমাজ বিদ্যা ও রাষ্ট্রনৈতিক চাতুর্য এগুলি ওদের হাতে তুলে দেবার কৌশলটুকু আমাদের শিখতে হবে। এর ফলে ওরা ওদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে; স্বনির্ভর হয়ে আপন মর্যাদা শক্তির বৃদ্ধি ঘটাব।

আমার এটা বদ্ধমূল ধারণা যে আমরা যদি এই দুর্বল মানুষগুলিকে স্ববশ হবার, আত্মসহায় হবার কাজে সাহায্য করতে পারি তা হ'লে আমাদের বৈদেশিক কূটনীতিক সম্পর্কের কতকগুলি জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে; আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও কতকগুলি নতুন জটিল প্রশ্নের মীমাংসাও হতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাজ ও কথা

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এশিয়া ও আফ্রিকায় অধুনাতন কালে যে আধুনিকীকরণ চলেছে দ্রুত তালে, তার মূলে রয়েছে ঠাণ্ডা লড়াই। কমিউনিস্টদের প্রভাবে ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র দ্রুত বিকল হয়ে পড়ছে এবং নতুন নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে উভয় পক্ষ থেকেই স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে; আর্থনীতিক ও সামরিক সাহায্য দিয়ে তাদের বন্ধুত্বলাভের প্রয়াস অতিমাত্রায় প্রকট।

একথা মিথ্যা নয় যে এই বন্ধু সংগ্রহের ব্যাপারে আমেরিকা খুব সুবিধা করতে পারছে না। আমাদের উদার দাক্ষিণ্য, আমাদের কুটনীতিক চাল, আমাদের প্রচারকার্য, এর কোনটাই আমাদের অনুগামী বন্ধু সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি। আমাদের সকল প্রচেষ্টার গোড়ায় কোন মৌল গলদ রয়ে গেছে। আমাদের অভাবিত অর্থসাহায্য, খাদ্য, কাঁচা মাল, কলকব্জা ও জঙ্গী সাহায্য—এতো পেয়েও গ্রহীতার বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যের ভাব যে কেন এলো, তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। সাহায্যদানের পদ্ধতির ব্যাপারে আমাদের ত্রুটি হয়ত ঘটছে কিন্তু তা পুরোপুরি গ্রহীতার এই অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়াটুকুকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

গ্রহীতার মনোভাব বোঝা ও তার প্রয়োজনের যথাযথ মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি বলেই এমনটা ঘটছে, এ কথাও কেউ কেউ বলেছেন। এই ধরনের ইঙ্গিত করা হয়েছে যে যদি আমাদের সাহায্যটুকু সর্বাত্মক সাহায্য হয়ে উঠতে পারত, যদি আমাদের সাহায্যদানের পদ্ধতিটি ত্রুটিশূন্য হত, তা হলে হয়ত সারা পৃথিবীটা আমাদের দলে থাকত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা যতই চিন্তা করি ততই এ কথা স্পষ্ট করে বুঝি যে আমাদের সাহায্যদানের নীতি ও রীতি পদ্ধতির দ্বারা আমাদের প্রতি গ্রহীতার মনোভাব নিরূপিত হচ্ছে না।

আমরা যাদের সাহায্য করতে চাইছি তাদের এবং আমাদের মধ্যে এক

সম্প্রদায়ের মানুষ মধ্যস্থতা করছেন, এরা ওদের মুখপাত্র স্বরূপ। এদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ও ছাত্রেরা, লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী মানুষের দল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেক দেশে আমরা যে অযৌক্তিক তীব্র আমেরিকা বিদ্বেষ লক্ষ্য করেছি তার মূলে রয়েছে এই মুখর সম্প্রদায়টি। সুতরাং এ কথা চলে যে 'এই বাক্' সর্বস্ব সম্প্রদায়টির সঙ্গে বিংশ শতকের আমেরিকার একটা সহজ ও স্বাভাবিক বিরোধ রয়েছে। আমাদের নীতির গুণাগুণের দ্বারা উত্ত্যক্ত হন না ; আমাদের অস্তিত্বটুকুই তাঁদের বিরক্তির কারণ। বুদ্ধিজীবী মানুষেরা সর্বত্রই আমেরিকা থেকে বিপদের আশঙ্কা করে। এই সহজাত ভয়ের প্রকাশ ঘটে মার্কিন নীতি-রীতির ত্রুটি-বিচ্যুতি আবিষ্কারে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এই ভয়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা খুবই দরকার।

আমরা যে সব সভ্যতার কথা জানি, তাদের সবার সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে বুদ্ধিজীবী মানুষ বলতে আমরা শাসক গোষ্ঠীর একজনাকে অথবা তাদের খুব অন্তরঙ্গ কাউকে বুঝি। এই সত্যটা বিশেষ ক'রে মধ্য-যুগীয় ইউরোপ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। প্রাচীন মিশর ও মহাচীনে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষ বলতে আমরা বিচারক ও প্রশাসকদের বুঝতাম ; তারা ছিল জনগণের মধ্যে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণবর্ণ ছিল শ্রেষ্ঠ বর্ণ এবং এরাই ছিল শিক্ষিত। সনাতন গ্রীসদেশেও দার্শনিক, নাট্যকার কবি, ইতিহাসবেত্তা ও শিল্পীরাই হলেন সৈনিক, নাবিক, আইনপ্রণেতা, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ কাজের মানুষের দল। রোম সাম্রাজ্যেও আমরা দেখেছি যে গ্রীক বুদ্ধিজীবী মানুষের সঙ্গে রোমক কাজের মানুষের সঙ্গে একটা নিবিড় মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রোমানদের কাছে গ্রীক বুদ্ধিজীবী মানুষের বিশেষ প্রয়োজন ছিল—তাদের সৌন্দর্য-পিপাসা মেটানোর জন্য, তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য চালানোর জন্য গ্রীসদেশের মানুষদের প্রয়োজন ছিল। গ্রীক বুদ্ধিজীবী মানুষের ওপর এই নির্ভরশীলতাই কালক্রমে গ্রীস-প্রভাবিত ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে রোমক শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করল। মধ্যযুগের ইউরোপে অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষই হলেন পাদ্রী সম্প্রদায়ভুক্ত ; এঁরাই হ'লেন বিশিষ্ট নাগরিক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আধুনিক ইউরোপের

জন্ম হল এবং এই সময়েই ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মানুষের পদমর্যাদায় একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল।

চতুর্দশ শতাব্দীর ভয়াবহ ঘটনাবলীর ফলে ইউরোপীয় জনসাধারণের উপর ক্যাথলিক পাদ্রীদের প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পেলো। 'ব্ল্যাক ডেথ' অর্থাৎ চতুর্দশ শতকে ইউরোপে সংঘটিত বিউবনিক প্লেগ মহামারী জনসাধারণের বেশ একটা বড় অংশকে এবং অর্ধেক পাত্রী সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। এই ভয়াবহ মহামারী এবং চার্চের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব শিথিল হবার মূলে ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হল শিক্ষাক্ষেত্রে কাগজ এবং মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহার এব ফলে শিক্ষার ওপর সার্বভৌম চার্চের কর্তৃত্ব লোপ পেতে বসল। চার্চ-বহির্ভূত একটি বৃহৎ শিক্ষিত সমাজের উদ্ভব হল; শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক ও লেখকদের একটি বিরাট গোষ্ঠী গড়ে উঠল। এরা কোন বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীসমাজের সভ্য নয়, এদের সামাজিক উপযোগিতা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ধ'রে নেওয়া হয়নি।

আধুনিক কালে পশ্চিম জগতে ক্ষমতা রয়েছে কাজের মানুষের হাতে; জমিদার, সেনানী, ব্যবসাজীবী, শিল্পপতি এবং তাদের আশ্রিত মানুষেরাই এই শক্তির আধার। বুদ্ধিজীবী মানুষকে এরা দরিদ্র আত্মীয় পরিজন রূপে গণ্য করে এসেছেন এবং এই শক্তির ছিটে ফোঁটা তাদের ভাগ্যে ঘটেছে। তাঁরা শিক্ষকতা ক'রে, সাংবাদিকতা করে অথবা অন্য কোন রকমে মাথার কাজ করে নিজেদের অন্নসংস্থান করেছেন। যখন এঁদের মূল্য লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক অথবা শিক্ষাবিদ্‌রূপে স্বীকৃত হয়, এঁরা পুরস্কৃতও হন, তখনও এঁরা কিন্তু বাছাই করা সেরা মানুষদের পংক্তিতে স্থান পান না।

রেনেসাঁসের কাল থেকে পশ্চিমে বুদ্ধিজীবীরা আপনাদের জন্য তাই স্বীকৃতির মর্যাদাটুকু চেয়েছেন। তাঁদের উপযোগিতা স্বীকার ক'রে নেবার জন্য তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদার ক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য তাঁরা নিরলস সাধনা করে চলেছেন। রিফরমেশন বা সংস্কার সাধন আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিকতম জাতীয় অথবা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পর্যন্ত প্রায় সকল আন্দোলনেরই নেতৃত্ব এঁরা করেছেন। কিন্তু তবুও কী ক'রে এইসব আন্দোলনের নেতৃত্ব পদটুকু বজায় রাখা যায় এবং এইসব আন্দোলনের ফলশ্রুতি স্বরূপ যে সব নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হচ্ছে তার কর্ণধার হওয়া যায়,

সে তত্ত্বটুকু এঁদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল অথচ এসকলের আন্দোলনের প্রবর্তনে এবং উন্নয়নে এঁরা কত কিছুই না করেছিলেন। যারা কাজের লোক, যারা গোঁড়া কর্মী তারা এসে এই বুদ্ধিজীবীদের ক্ষমতাচ্যুত করে দিয়েছে। এটা ঘটেছে সারা পশ্চিম জগৎ জুড়ে বিগত একশো বছর ধ'রে। বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে।

এই ধরনের আন্দোলনের কর্ণধার হয়েছেন কবি, লেখক, ইতিহাসবেত্তা, পণ্ডিত এবং দার্শনিকের দল; এঁরা ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে জাতীয় সংহতির উক্ত পরিবেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন দেশের শাসনতন্ত্র প্রণেতা হিসেবে, রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসেবে এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। যে সব নাগরিক কাজের লোক বলে খ্যাত, যাঁদের জাতীয় সংহতির স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়, যাঁদের জাতীয়তার রক্ষাকর্তা বলা হয়। এঁরা সবাই আন্দোলনের গোড়ার দিকে কিছুটা নিষ্ক্রিয় থাকেন কিন্তু আন্দোলন যখন চলতে থাকে তখন এঁরা এগিয়ে এসে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন; যখন জাতীয় পরিবেশ দানা বেঁধে ওঠে, তখন এঁরা এসে তার নিয়ন্ত্রণ ভার নেন। বুদ্ধিজীবীর দল অখ্যাতির মধ্যে পরিত্যক্ত হয়। অতীতে রাজরাজড়ার আমলে তাঁদের যে অবস্থা আজকের জাতীয় অভ্যুত্থানের যুগেও তাঁদের সেই একই অবস্থা। তাই আমাদের মনে হয় যে বুদ্ধিজীবী মানুষেরা এই জাতীয় অস্তিত্বের পর্যায়কে উত্তরণ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে চায়।

পশ্চিমী প্রভাবে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়া এবং আফ্রিকায় এক দল বাক্‌সর্বস্ব মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে; এঁরা কোন দলভুক্ত নন। এঁরা মর্যাদা এবং গুরুত্ব চেয়েছেন নিজেদের জন্য, এঁদের সামাজিক প্রয়োজনীয়তাটুকুর স্বীকৃতি চেয়েছেন। ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের মতই এঁরা জাতীয় এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিস্তার চেয়েছেন।

পশ্চিমী সমাজে এবং পশ্চিমী সভ্যতা প্রভাবিত সমাজ ব্যবস্থায় এই বুদ্ধিজীবীরা আজ নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে; কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষ-আশ্রয়ী যে সভ্যতা সেখানে এই বুদ্ধিজীবীদের স্থান একেবারেই নেই। এই

মার্কামারা বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য ছাড়াই আমেরিকা তার জটিল আর্থনীতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রেখেছে, দেশের মানুষের সাংস্কৃতিক প্রয়োজনও তারা মিটিয়েছে এই বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য ব্যতিরেকে। আমেরিকা ছাড়া অন্য কোথাও দেশের শাসন ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের কর্তৃত্ব এতো কম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যে সব বুদ্ধিজীবী মানুষ রয়েছেন তাঁরা ভীত হয়েছেন আমেরিকার প্রভাব মণ্ডলের ক্রম বিস্তারে, তাঁরা শুধু তাঁদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে ভীত নন, তাঁরা তাঁদের অস্তিত্ব বজায় থাকা সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে উঠেছেন।

এটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে যে আমরা যখন আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং কমিউনিস্ট মতাবলম্বী দেশের সমাজব্যবস্থার মধ্যেকার ভেদটুকু সম্বন্ধে আলোচনা করি তখন বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীব এই মৌল পার্থক্যটুকুর কোন উল্লেখই করি না। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে বুদ্ধিজীবীরা যে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠ করেছে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে উচ্চতম সামাজিক পর্যায়ের খুব কাছাকাছি রয়েছেন সেদেশের লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর দল; তাঁরা তাঁদের সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে এতোটুকু সন্দিহান নন! অভ্যুত্থানশীল জন-সমাজের তাঁরাই হলেন আদর্শস্থল। Czelaw Milosz কমিউনিস্ট দেশের বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে বলেছেন যে মধ্যযুগেব পর থেকে আর কখনো তাঁরা এভাবে স্বীকৃতিলাভ করেননি এবং তাঁদের সামাজিক উপযোগিতাও এতোখানি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি।* কমিউনিস্ট দেশগুলি থেকে যাঁরা পালিয়ে আসেন

---

* কমিউনিস্ট দেশে বুদ্ধিজীবীদের যে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে বা হত্যা করা হয়েছে, এর দ্বারা উপরোক্ত সত্যের খণ্ডন হয়নি। বুদ্ধিজীবী মানুষ চান যে তাঁকে যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়, ইতিহাসের রূপায়ণে তাঁর যেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। যে দেশে তাঁর প্রত্যেকটি কথা যাচাই ক'রে দেখা হয় যেখানে তাঁর মতিগতির ওপর কড়া নজর রাখা হয়, সেখানে বুদ্ধিজীবী অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। যেদেশের মানুষেরা তাঁর কথায় বা কাজে এতোটুকু আগ্রহ প্রকাশ করে না, সেদেশে এঁরা অস্বস্তিবোধ করেন। অবজ্ঞার চেয়ে এই বুদ্ধিজীবীরা অত্যাচারকে বরণ করে নিতে সদাসর্বদা প্রস্তুত।

তাঁদের অধিকাংশই হলেন কাজের লোক ; সেনানী, কুটনীতিবিদ, ক্রীড়াবিদ, কারিগব এবং কুশলী মিস্ত্রিরা এঁদের মধ্যে রয়েছেন। বুদ্ধিজীবীরা কমিউনিস্ট দেশের বাইরে ভ্রমণে এসেও কখনো দেশত্যাগ ক'রে অন্য কোথাও আশ্রয় চান না। প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে একটা গুরুত্বপুর্ণ যোগ রয়েছে, এ সমাজে কমিউনিস্টরা সব সময়ে সচেতন। স্তালিনের কথায় বলি : তারা এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী যে, 'কোন শাসকগোষ্ঠীই তার নিজস্ব বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে পরিহার করে কাজ:চালাতে পারে না। এই বুদ্ধিজীবী মানুষদের সক্রিয় সর্বত:-সমর্থন ব্যতিরেকেই অ্যাংলো-স্যাক্সন জগতে সামাজিক সাম্যাবস্থা রক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের মতামত গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠল, বর্তমান সামাজিক বিধান সম্বন্ধে তাঁদের কী মত, এ সম্বন্ধে সকলেই আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন। কারণ, ঠাণ্ডা লড়াইয়ে কাজের মতই কথারও মূল্য আছে। পৃথিবীব সর্বত্র আজ যে মানুষের মন জয় করবার জন্য চেষ্টা চলেছে সেখানে আমরা কথার পসরা সাজিয়ে ধরতে পারিনি। যারা দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কথা বলে, যারা অবলীলাক্রমে নরহত্যা করে এবং একই সঙ্গে মনুষ্যসমাজের ত্রাণকর্তা' রূপে অভিনয় করে, তাদের মুখোশ আমরা খুলে দিতে পারিনি ; শুধুমাত্র সেবাব মধ্য দিয়ে, কাজের মধ্য দিয়ে এটুকু সম্পন্ন করা যায় না। বাক্য এবং শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা আমরা হয়ত স্তালিন এবং তাঁর জঘন্য কার্যাবলীকে তাদের নিন্দনীয় বীভৎসতায় কমিউনিস্ট দেশের জনসাধারণের কাছে পর্যন্ত তুলে ধরতে পারতাম ; আমাদের বন্ধু এবং নিরপেক্ষ দেশের মানুষদের সামনে এই নগ্ন সত্য তুলে ধরা আরো সহজ ছিল।

আমাদের দেশের কাজের মানুষ যাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক্ না কেন, তাঁরা এই মন জয় করে নেবার যুদ্ধে আমাদের প্রবক্তা হতে পারেননি। আমাদের শাসতন্ত্রের নিয়ন্তা যেই হোক্ না কেন, আমাদের মুখপাত্র হবেন আমাদের দেশের অগ্রচারী কবিকুল, দার্শনিকবৃন্দ, শিল্পী-সমাজ, লেখকগোষ্ঠী, বিজ্ঞানী এবং অধ্যাপকেরা। পৃথিবীর সর্বত্র হতোদ্যম লক্ষ লক্ষ নরনারীর কাছে সকল বাধা অতিক্রম করে যদি পৌছুতে হয় তবে একমাত্র এঁরাই সে কাজ করতে পারবেন। যখন যুদ্ধ হয় তখন আমরা

স্বতঃই যুনিফর্মপরা জঙ্গী মানুষদের কাজের তারিফ করি। তেমি ধারা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময় বুদ্ধিজীবীদের কাজেরও তারিফ করতে হবে। সমগ্র জাতির উজ্জীবনে এই বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। শাসন-নীতির প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণে এদের সক্রিয় ভূমিকা থাকা চাই। প্রয়োজন হলে এঁরা এই নীতির ব্যাখ্যা করবেন, বিরুদ্ধ সমালোচনার সামনে এই নীতির পোষকতা ও সমর্থন করবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনুকৃতি ও গোঁড়ামি

এখনো আমরা অনুন্নত দেশের আধুনিকীকরণ বলতে বুঝি দেশটার সব কিছুকে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার ধাঁচে ঢেলে সাজা। এদের রীতি-পদ্ধতি, এদের মনোবৃত্তি, এদের দৃষ্টিভঙ্গী আমরা অনুন্নত দেশগুলিতে আরোপ করি। তা হলে দ্রুত আধুনিকীকরণের অর্থ হল এক ধরনের অনুকৃতি; এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমাদের মনে:জাগে যে দ্রুত আধুনিকীকরণের ফলে যে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় তার মূলে যখন রয়েছে এই অনুকৃতি তখন এই নকল করার প্রেরণার মধ্যেই কী বহু দৃষ্ট বিপর্যয় সম্ভাবনাটুকু অনুস্যূত হয়ে নেই ?

সাধারণ প্রত্যাশার বৈপরীত্য হিসেবে এ কথা বলা যায় যে অনুন্নত দেশের পক্ষে উন্নত দেশকে নকল করা যত সহজ তার চেয়ে অনেক বেশী সহজসাধ্য উন্নত দেশের পক্ষে অনুন্নত দেশকে নকল করা। দুর্বল অনুন্নত দেশ যখন উন্নত দেশকে অনুকরণ করে তখন তারা এই অনুকরণের মধ্যে নিজেদের অপূর্ণতা ও আত্মসমর্পণটুকু লক্ষ্য করে। এই হীনম্মন্যতাটুকু তাদের পরিহার করতে হবে, শক্তির আস্ফালনটুকু দেখবার সুযোগ তাদের দিতে হবে। তবেই বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অমূল্য সম্পদ আহরণ করার জন্য তারা তাদের চিত্ত ও হৃদয়কে উন্মুখ ক'রে তুলবে। ইতিহাসে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে বিজেতারা বিজিতদের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় বহু বিদ্যা শিখে নিয়েছে। দ্য তকভিল বলেন যে অনুন্নত মানুষেরা "অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য এগিয়ে যাবে কিন্তু যদি জনগণ অযাচিতভাবে তাদের কাছে আসে তবে তারা তাকে অস্বীকার করবে।' তাই যখন কোন অনুন্নত দেশের দ্রুত আধুনিকীকরণের সময়ে আমরা মানুষদের মধ্যে এক অদ্ভুত মনোভাব, নিষ্ঠুর আচরণ, মিথ্যা অভিনয়, রূঢ় অহংবোধ এবং একটা ন্যক্কারজনক তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী প্রত্যক্ষ করি, তখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে দুর্বল অনুন্নত মানুষদের পক্ষে এমতাবস্থায় আত্ম-শক্তি ও আত্ম-উৎকর্ষের একটা ছদ্ম-আবরণের প্রয়োজন রয়েছে। এই

আবরণটুকু ছাড়া, এই মিথ্যাচারটুকু ছাড়া তারা সহজে দ্রুততালে অনুকরণ করতে পারে না।

অত্যল্পকালের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া যে আপন চেষ্টায় অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে, এই দৃষ্টান্তটুকুর আবেদন অসংশয়ে অনগ্রসর দেশগুলির কাছে গ্রাহ্য এবং স্বীকৃত। অনুন্নত একটি জাতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তুলে তাকে জয়ী করে দেবার শক্তি যে কমিউনিস্টদের আছে, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত এবং এর ফলও তারা বহু ক্ষেত্রেই পেয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থায় মানুষের মনে কাজ করার জন্য একটা স্থায়ী আগ্রহের সৃষ্টি করা সম্ভব কী না এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও তারা যে অনুন্নত দেশের মানুষদের নিয়ে খুব কার্যকরী যোদ্ধবাহিনী গঠন করতে পারে, এ কথা অসংশয়িত সত্য। এই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তারা এক অনমনীয় যোদ্ধসুলভ মনোভাবের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। পশ্চিমী গণতন্ত্র অনুন্নত দেশগুলির মানুষদের মধ্যে গর্ব ও উৎসাহ ও আত্মবলির উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারে না; তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাদের চেষ্টা বিফল হবে। কেননা এই অনুন্নত মানুষেরা আপনাদের হীনতা ও পশ্চাদ্‌বর্তিতা সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতন। এশিয়া এবং আফ্রিকায় খ্রীষ্টধর্ম ও গণতন্ত্র নিজ নিজ মূল প্রোথিত করতে পারেনি কারণ দুর্বলকে বিজেতায় পরিণত করার হাতিয়ার হিসেবে এদের ব্যবহার করা যায়নি।* জাতীয়তা এবং শিল্পায়ন হল পশ্চিমের অপর দুটি দান। এরা এই ধরনের ফল দিতে পারে বলেই সর্বত্রই এরা গ্রাহ্য। এটা খুবই অর্থপূর্ণ ঘটনা যে জেসুইট পাদ্রী সম্প্রদায় যখন চীন মহাদেশে প্রথম এলেন ধর্মপ্রচারের জন্য, তখন তাঁদের কামান তৈরীর কাজে নিয়োগ করা হল এবং তাঁরা হয়ে পড়লেন অস্ত্রশালার অধ্যক্ষ।

যদি পশ্চিমীকরণকে অনুকৃতির পর্যায় হিসাবে গ্রহণ করা যায়, তা হলে

---

* ইসলাম ধর্মকে এই ধরনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা গিয়েছিল বলে এশিয়া এবং আফ্রিকায় ইসলামের বহুল প্রচার সম্ভব হয়েছিল। আজকের দিনেও আফ্রিকায় নব-দীক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা কম নয়। এ কথা না ভেবে পারা যায় না যে, মুসলমান মোল্লারা যদি তাঁদের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে কিছু কিছু কারিগরী জ্ঞানও বিতরণ করতেন তা হলে ইসলামের বিস্তার হত বিস্ময়কর।

একথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে, কেন অনুন্নত দেশের মানুষেরা পশ্চিমকে অনুকরণ করে পশ্চিম-বিদ্বেষী হয়ে উঠে। যাঁরা আমাদের মত হতে চান, তাঁরা যে আমাদের ভালোবাসেন, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। অনুকরণের মধ্যে যে হীনম্মন্যতা রয়েছে তা বিরক্তির জনক। যিনি অনুকরণ করেন তাঁর চেষ্টা হল কী করে মডেলকে অর্থাৎ অনুকরণের আদর্শকে অতিক্রম করে যাওয়া যায়, কী ক'রে প্রয়োজন হলে এই আদর্শটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় পৃথিবীর বুক থেকে। ইতিহাসের পাতায় কখনও কখনও শেষোক্তটিকেই প্রথমে অনুষ্ঠিত হ'তে দেখেছি। অনুকারী অনুকরণের মডেলটিকে আগেই ধ্বংস ক'রে দিয়েছেন, তারপরে তার অনুকরণের চেষ্টা চয়েছে। যখন আমরা কোন পরাভূত আদর্শ বা মৃত মডেলের অনুকরণ করি, তখন কোন রকমের অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না।

অবশ্য যেক্ষেত্রে অনুকারী কায়মনোবাক্যে অনুকরণের আদর্শের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেন সেক্ষেত্রে অনুকরণ কোন বিরক্তি বা ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠবে না. এটুকু আমরা আশা করতে পারি। এটা এ কালের পরম দুর্ভাগ্য যে পশ্চিমী অনুকবণের ঢেউ উঠলেও যারা পশ্চিমকে অনুকরণ করছে সেই সব জাগ্রত দেশগুলি পশ্চিমের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি ; অবশ্য নানান কাবণে এটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। উপনিবেশ থাকাকালীন সাম্প্রতিক স্মৃতি, কৃষ্ণবর্ণ-শ্বেতকায় দ্বন্দ্ব, ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় বিপন্নতা, জীবনমানের দুস্তর ব্যবধান এ সকল তো আছেই, তা ছাড়া অনুন্নত দেশগুলিতে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের মনে এক ধরনের ভীতি আছে যে গণতন্ত্র এবং স্বাধীন উদ্যোগের শক্তি তাদের জন্মগত নেতৃত্বের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করবে, এ সবে মিলে পশ্চিমের প্রতি একটা সংশয় জাগিয়ে দিয়েছে, একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছে।

এটা অবশ্যই আশা করা যায় যে যখন অনুকৃতিকার মনে করেন যে অনুকরণ করে অনুকরণের মডেলের বিপরীতধর্মী কিছু একটা তিনি হয়ে উঠছেন তখনই অনুকরণক্রিয়াটি নির্ঝঞ্ঝাটে সম্পন্ন কবা যায়। একটা বিদেশী ধর্ম অথবা সভ্যতাকে অন্য সমাজে অনুস্যূত ক'রে দেওয়া সহজ হয় সমাজের বিধর্মী ছেলেমেয়েদের মধ্যস্থতায়। এই বিধর্মী বা নাস্তিকের দল হয়ত ঐ ধর্ম ও সভ্যতার উগ্র সমালোচক ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বী। বিরুদ্ধতা

অনেক সময়ে ভাব, ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-রীতির প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করে। দূর প্রাচ্যকে ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী মতবাদ (বৌদ্ধ ধর্ম) সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করেছিল, ইহুদী ধর্মের বিরোধিতা করল যে খ্রীষ্টধর্ম তা-ই কালক্রমে পৃথিবী ছেয়ে ফেলল। খ্রীষ্টধর্ম যখন থেকে সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পেলো, তখন তার যে গ্রীক-রোমক সাম্রাজ্যের বাইরে বিস্তার ঘটেছিল তার মূলে ছিল এই ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা। নেস্টোরিয়নরা ছিলেন সেমাইট, জ্যাকবাইটরা মিশরীয় এবং ডনাটিস্টরা ছিলেন বারবার; এবং যদি আমরা অনুন্নত দেশগুলিতে পশ্চিমী ম্যানায়িজম আমদানি করে থাকি কমিউনিজমের মাধ্যমে, তা হ'লে আমাদের মনে রাখা দরকার যে কমিউনিজম হল পশ্চিম দেশের মানুষদের ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ এবং পশ্চিম এই প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে।

আমরা এই বিদ্রোহ বা বিধর্মিতার মূল সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনুসন্ধান করব কেননা আমরা কমিউনিজম্‌কে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে গণ্য করেছি। যে ব্যবস্থায় প্রাণশক্তির প্রাচুর্য তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সম্ভব হয়। যে ব্যবস্থার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও হয় না এবং এই বিপ্লবী ব্যবস্থা প্রথাগত ব্যবস্থার উচ্ছেদও করে না। খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের সময় ইহুদীধর্মের জঙ্গীশক্তির পূর্ণ জোয়ার এসেছিল এবং অন্য কতকগুলি ধর্মমতের মতই খ্রীষ্টধর্ম ইহুদীধর্মের বিরোধিতা করেছিল। আবার খ্রীষ্টধর্মে যখন পূর্ণ যৌবনের জোয়ার, তখন তার বন্ধন বিরোধিতা হতে দেখেছি; ইউরোপে যখন খ্রীষ্টধর্মের প্রসার ঘটছে তখন ও এই বিরুদ্ধতার অন্ত ছিল না। মানুষের ধর্মোন্মাদনার যুগেই একদিকে যেমন সাধু-সন্ত ও শহীদদের আবির্ভাব ঘটে, ঠিক তেমনি বিধর্মিতা ও বিভেদেরও অন্ত থাকে না। যেখানে সনাতন গোঁড়ামি ও নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য শিকড় গেড়ে বসেছে, সেক্ষেত্রে বিরোধিতা এবং প্রতিবাদও বিশেষ জোরদার হয়ে উঠতে পারে না। ধনতন্ত্রের প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ছিল বলেই এই ধরনের প্রবল প্রতিবাদ অর্থাৎ কমিউনিজম্‌ সম্ভব হল। কমিনিউজম্‌কে টোয়েন্‌বী প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে মনে করেন; কিন্তু এরা যখন একথা বলেন তখন খ্রীষ্ট ধর্মের বর্তমান অবস্থা ও কমিউনিজমের স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

আমরা মনে করি যে, কোন ধর্মের প্রাণশক্তির প্রাচুর্য থেকেই বিধর্মিতা জন্মলাভ করে। মূল ধর্ম থেকে বিধর্মিতা আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়; প্রান্তিক মতের অনুসরণ করে, গোঁড়ামিকে আশ্রয় করে, আপন আদর্শের চটকদার প্রচারে বিধর্মীরা এটা সম্পন্ন করে। বাড়িয়ে বলে কোন একটি সত্যকে তার বিপরীত সত্যের রূপ দেওয়া খুবকঠিন নয়। যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে অধ্যাপক জোসেফ ক্লাউজনার বলেন "তিনি ইহুদীধর্মের অস্বাভাবিক পরিপূর্তি ঘটিয়ে ইহুদীধর্ম বিরোধী এক ধর্মের প্রবর্ত্তন করতে তাঁর শিশুদের অনুপ্রাণিত করলেন"। ঠিক এইভাবে কমিউনিস্টরা ধনতন্ত্রের পরিপুর্ণতাটুকু ঘটিয়ে দিয়ে ধনতন্ত্রবিরোধী এক সমাজব্যবস্থার পত্তন করলেন। ধনতন্ত্র স্বচ্ছ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ধনতান্ত্রিকের সর্বশক্তির আধার হয়ে ওঠার স্বপ্নটুকু লক্ষ্য করেছি। এঁরা কোথাও কোন বাইরের হস্তক্ষেপ চাননি, এঁরা চেয়েছিলেন যে-রাষ্ট্রটী পুরোপুরি একটা যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠুক্, এটা হোক্ কোম্পানি বা ব্যবসায়ী রাষ্ট্র'। রাষ্ট্রের মধ্যে যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠুক এটা এঁদের কাম্য ছিল না। কতিপয় ধনতান্ত্রিক মানুষ তাঁদের সুদূর উপনিবেশগুলিতে এই ধরণের ব্যবসায়ী রাষ্ট্র পত্তনের স্বপ্নটুকু সফল করে তুলতে চাইলেন; কেননা সেখানে স্বদেশের ঐতিহ্য ও আচরণ বিধি মেনে চলবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু স্বদেশের ঐ ধরনের স্বপ্নকে এঁরা সত্য করে তুলতে পারলেন না; কিন্তু কমিউনিস্টরা স্বদেশে এই স্বপ্নটুকুকে সত্য করে তুলল। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন অমিত্র একনায়কতান্ত্রিক সংগঠন; এঁরা সারা দেশকে গ্রাস করেন; দেশের সবটুকু জমি, সমস্ত গৃহভবনাদি, কলকারখানা এঁদের দখলে; আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলের দেহ ও মনের ওপরও এঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য। এই ধনতান্ত্রিকসত্তম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হল দাসপ্রতিম প্রজাদের মধ্যে থেকে ভালো ভালো কারিগর তৈরি করা; তাদের মনকে এমন ভাবে গ'ড়ে তোলেন এঁরা যে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এরা অক্লেশে পরিশ্রম করে; এরা যে বেঁচে আছে এতেই এরা খুশী হয়ে এদের শোষকদের আশীর্বাদ করে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই ধরনের 'ব্যবসায়ী রাষ্ট্র' সারা পৃথিবীতে আপনাদের অধিকার পত্তন ও কায়েম করতে চাইবে।

এই ধরনের কমিউনিস্ট বা সাম্য রাষ্ট্র যখন সম্পূর্ণরূপে স্তালিনীয়

বিষপ্রভাব থেকে আপনাকে মুক্ত রাখে তখনও আমরা এ কথা বলতে পারি যে সেই রাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের অতিপূর্ণতাটুকু প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন বহুলাংসে হ্রাস পায় তা মালিকের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির অপপ্রয়াসের জন্য। শ্রমবিমুখ শ্রমিক এবং খরিদ্দারের খেয়ালখুসির জন্যও উৎপাদন হ্রাস পায়। উৎপাদন অবক্ষয়ী এই সব হেতুগুলির নিরাকরণ করতে হ'লে বিপুল শ্রমশক্তি ও কাঁচামালের দরকার। কমিউনিজম তার পুচ্ছতাড়নায় এই সর্বশক্তিমান মালিক, খরিদ্দার ও শ্রমিক. সকলকে ধনতন্ত্রের চৌহদ্দিব বাইরে নির্বাসিত করে দিল। উৎপাদন এঁদের দেবতা; যিনি আপস রফা করতে জানেন না; উৎপাদনের কেউ বাধা সৃষ্টি করলে এঁরা কখনই তা বরদাস্ত করেন না।

অন্যান্য বিধর্মী আন্দোলনের মতই কমিউনিজমও একই পন্থা অনুসরণ করছে; ধনতন্ত্রকে ধনতান্ত্রিকদের থেকে পৃথক করে দেখার যে নীতি কমিউনিস্টরা অনুসরণ করছেন তা এই সঠিক পন্থার অংশমাত্র। খ্রীষ্টীয় ধর্মদ্রোহ ইহুদীদের থেকে ইহুদীধর্মকে পৃথক করে দেখেছিল; প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমত ক্যাথলিক যাজকতন্ত্র থেকে ক্যাথলিক ধর্মকে পৃথক বলে গণ্য করেছিল। ক্রনস্টাট বিদ্রোহের শ্লোগানের কথা মনে রেখে এ কথা বলা চলে যে পরিণামে কমিউনিস্ট দ্রোহিতার শ্লোগান হবে: 'কমিউনিস্টবিহীন কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থা'।

আমরা যদি এ সম্বন্ধে সচেতন হই যে দ্রুত আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটুকু মূলতঃ অনুকৃতিমাত্র, তা হলে অনুন্নত দেশগুলিতে যে সব অশান্তি চলেছে তার অর্থ খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হবেনা; বর্তমানে তাঁরা যা কিছু করছেন তার স্থায়িত্বের পরিমাপ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। যন্ত্রযুগের প্রারম্ভে ইউরোপ ও আমেরিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা যা ছিল তার সঙ্গে বর্তমান কালের অনুন্নত দেশগুলির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তুলনা করলে উভয়ের মধ্যেকাব মৌল পার্থক্যটুকু ধরা পড়ে; স্বতঃই তখন মনে প্রশ্ন জাগে, পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞান এতদ্দেশে আমদানি করলে কী ফলপ্রসূ হবে? সেই যাই হোক, যখন আমরা এ কথা স্মরণে রাখি যে এই সব দেশে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা যৌথ অনুকরণ মাত্র, তখন বিচার ভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটে। সৃষ্টির পথে যে পরিবেশ প্রশস্ত,

অনুকরণের পক্ষে তা প্রশস্ত নাও হ'তে পারে। শিথিল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সৃষ্টিকর্ম সহজ হয়, কেননা মানুষ সেখানে স্বকৃত অপচয়ের পূরণের অবকাশ পায়; সে তখন মনোবৃত্তির অনুসরণ করে এবং লাভের আশায় বিপদের ঝুঁকিও নিতে পারে। পরন্তু অনুকরণ সেক্ষেত্রেই প্রশস্ততম যেখানে সামাজিক যুথবদ্ধতা নিশ্ছিদ্র ও যৌথ কর্মসূচী অবশ্য পালনীয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কবে সংগঠিত করা এই ধরণের ব্যবস্থার মুখ্য ধর্ম। মানুষ যেখানে কোন সুসম্বদ্ধ মণ্ডলীর সভ্য, যেখানে সে স্বভাবতঃই অধিকতর অনুকরণপ্রবণ। যেখানে সে আপনাব ব্যক্তি-সত্তার দ্বারা চালিত সেক্ষেত্রে সে অনুকরণ কবে না বললেই চলে। যুথবদ্ধ ব্যক্তি মানুষেব ব্যক্তিটুকু লুপ্তপ্রায়; বাইবের প্রভাব সে কাটিয়ে উঠতে পাবে না। এ ব্যাপারে শিশুব মতই সে অসহায়। সুতরাং স্ব-বিরোধী উক্তির মতো শোনালেও এ কথা সত্য যে দ্রুত আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজন হয় এক ধবনের আদিম সমাজ ব্যবস্থাব। সুতরাং অনুন্নত দেশগুলিতে যে ধরনের যূথবদ্ধ সামাজিক জীবনের প্রতি একটা পক্ষপাতিত্ব দেখা যায় তা পশ্চিমকে অনুকরণের ব্যাপারে অত্যন্ত অনুকূল হবে বলে মনে হয়। পশ্চিম দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের এই যুথবদ্ধতা বাধা না হয়ে বহুল পরিমাণে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কর্মে আগ্রহ

সেদিন আমি নিজে নিজে একটা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এক অদ্ভুত সমাধান খুঁজে পেলাম। প্রশ্নটা হল কমিউনিস্ট সরকাবেব কাছে কোন্ সমস্যাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? উত্তর পেলাম, এলব নদীব তীর থেকে চীন সমুদ্র পর্যন্ত সকল দেশেই কমিউনিস্ট সরকারগুলি চেযেছেন তাঁদের তাঁবেদাব মানুষদের কাজ করিয়ে নিতে; কেমন ক'রে তাদের দিয়ে মাঠে লাঙ্গল দিয়ে নিতে হবে, বীজবপন করতে হবে, ধান কাটাতে হবে, বাড়ী ঘর তৈরি করিয়ে নিতে হবে, খনিতে কাজে লাগাতে হবে, এগুলিই তাঁদের সব চেয়ে বড সমস্যা। তাঁদের দৈনন্দিন কর্মসূচীতে এদেব দিয়ে পরিশ্রম কবিয়ে নেওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর দ্বারাই এঁদেব আভ্যন্তীরণ শাসন নীতি এবং বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক নিরূপিত হয়ে থাকে।

আমাদের কাছে এটা বড বিস্ময়ের। কেননা কমিউনিস্ট আন্দোলন চেয়েছিল মানুষ এবং তাঁর সমাজের বিস্মযকর পরিবর্তন ঘটাতে; কিন্তু কার্যত তাঁরা মানুষের এই কর্মমুখীনতাটুকুকে বিস্ময়কর এবং অলৌকিক বলে গ্রহণ করলেন। আমাদের কাছে অবশ্য এই কাজেব প্রতি আগ্রহটুকু অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজ। পশ্চিম দেশে আমাদের সমস্যা হল মানুষকে কাজে উদ্বুদ্ধ করা নয়। কেমন করে কর্মেচ্ছু মানুষের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান করা যায়, সেটাই হল প্রধান সমস্যা। আমাদের কাছে আমাদের দেশের মানুষের কর্মস্পৃহাটুকু তার শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের স্পৃহার মতই স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু তবুও কমিউনিস্ট দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাদি লক্ষ করে একথা আমাদের মনে হয় যে কাজের প্রতি পশ্চিম দেশের মানুষের আগ্রহ সহজ এবং স্বাভাবিক হলেও তাকে বিস্ময়কর এবং অভূতপূর্ব বলা যেতে পারে ওঁদের দৃষ্টি কোণ থেকে। এই মনোভাব, এই দৃষ্টি ভঙ্গী অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিকালের; আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার এটা হল একটা বৈশিষ্ট্য এবং পূর্বেকার পশ্চিমী সভ্যতার মধ্যে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নি।

আমরা যে সব সভ্যদেশের কথা জানি সে সব দেশে এবং পশ্চিম দেশেও কয়েক শতাব্দী ধরে কাজকে অভিশাপরূপে গণ্য করা হয়েছে ; একে বন্ধনের প্রতীক বলা হয়েছে ; একে সমীহ করে কেউ কেউ বলেছেন 'আবশ্যিক অশুভ'। এই যে কাজকে আমরা সততা এবং মানুষের মূল্যায়নের নিরিখ হিসাবে দেখি, এই যে আমরা আমাদের দৈনিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও কাজ করি, এর কিন্তু ইতিহাসে জুড়ি পাওয়া ভার, পশ্চিম দেশের বাইরের মানুষের কাছে এটা একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার।

কাজের প্রতি পশ্চিমের এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সেন্ট বেনেডিক্টের বিধানে। এই বিধানে বলা হয়েছে যে বেনেডিক্টের অনুগামী যাজকদের শীতকালে ছ'ঘণ্টা এবং গ্রীষ্মকালে সাত ঘণ্টা করে দৈনিক কায়িক পরিশ্রম কবতে হবে। এর ফলে প্রাচীনপন্থীদের কাজের প্রতি যে একটা অবজ্ঞার মনোভাব ছিল, তাঁরা যে কাজকে দাসসুলভ জীবনধাবণের বৃত্তিরূপে গণ্য করতেন, তা রূপান্তরিত হল একটা শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-সূচক মনোভাবে। এই সব গির্জার চারপাশে যে নাগরিক সভ্যতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠল সেখানে আমরা এই পরিবর্তিত মনোভাবের দেখা পেয়েছি। তারপরে এর বিস্তার দূরে দূবান্তরে ঘটেছে। কিন্তু মধ্যযুগের মানুষদের মধ্যে আমরা এই কষ্ট বিমুখতা দেখেছিলাম। খুব নীচু জীবন মানের উপযোগী যৎসামান্য কাজ করেই তাঁরা কাজে ক্ষান্তি দিতেন। মাত্র ষোড়শ শতাব্দীতে কাজের প্রতি একটা অদ্ভুত আগ্রহের ভাব মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল।

ম্যাক্স বেবর এবং অন্যান্যদের মতে সাধারণ মানুষ আপন আপন কর্মের এবং বৃত্তির মর্যাদাটুকু উপলব্ধি করল লুথার প্রচারিত মানুষেব বৃত্তির পবিত্রতার তত্ত্ব শুনে ; ক্যালভিন কথিত ভাগ্যবাদও মানুষের আপন কর্মে ও বৃত্তিতে আস্থা ফিরিয়ে আনল। ক্যালভিন বললেন, মুক্তি এবং অনন্ত বন্ধনের কথা জগৎ সৃষ্টির মূলে রয়ে গেছে। মানুষ জানে না তার অন্তিম গতির কথা, অল্প কয়জনের জন্য পূর্বনির্ধারিত অন্তহীন জীবন অথবা বহুজনের জন্য ব্যবস্থিত চিরন্তন মৃত্যু-এর কোনটি তার ভাগ্য আছে। এ জানা ব্যক্তি-মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এ সত্য যখন ধরে নেওয়া হয় যে ভগবানের নির্বাচিত মানুষেরা তাদের সব কর্মেই সফল হয়, যারা ভগবানের বিরাগভাজন তারা

সকল সময়েই ব্যর্থ হয়, তখন সকলের পক্ষেই আপন আপন কর্মে পরিপূর্ণ রূপে আত্মনিয়োগ করাই স্বাভাবিক, কেননা কর্মের সাফল্য অর্জন করে তারা দেখাতে চায় যে তারাও মুক্তি পাবার যোগ্য শরিক। এরিখ ফ্রম যথার্থই বলেছেন যে এই তত্ত্ব-জনিত অনিশ্চয়তা মানুষকে মহৎ কর্মপ্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করে। তাই তিনি এই তত্ত্বকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তবুও আমাদের খুবই সন্দেহ হয় যে বিগত চারশো বছরে যে প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা আমরা পশ্চিম দেশে লক্ষ্য করেছি তার মূলে বোধ হয় শুধুমাত্র ধর্মোন্মদনা বা তজ্জাত কারণটুকু নেই। পশ্চিম দেশের আধুনিক সভ্যতার অগ্রগমনের মূলে মানুষের মনে ধর্মীয় তত্ত্বের যে প্রভাবটুকু কাজ করেছে, একমাত্র তা-ই রয়েছে একথা বললে ঠিক বলা হবে না। স্বস্থ ব্যক্তি মানুষের সামগ্রিক অভ্যুত্থান যে এটিকে সম্ভব করে তুলেছে, এ তত্ত্ব অনস্বীকার্য। এ কথা সত্য হতে পারে যে রিফর্‌মেশন আন্দোলন নিজেই মানুষের এই ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয়ের পরিণতি মাত্র।

কী ভাবে মধ্যযুগীয় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন থেকে ব্যক্তি মানুষ মুক্তি পেলো তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। সে যুগে অবস্থার গতিকে ধীরে ধীরে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামো এবং ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের সার্বিক প্রভাব পরিমণ্ডল লুপ্ত হতে চলল, কাগজ এবং ছাপাখানার আবিষ্কারের ও ব্যবহারের ফলে দেশে শিক্ষাবিস্তার সহজ হয়েছিল এবং তারই ফলে এটা সম্ভব হল। পশ্চিম ইউরোপের মানুষেরা, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক্ আপনার হারানো ব্যক্তি-সত্তাকে খুজে পেলো। পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে এটা ঘটল। এই যে বিচ্ছেদ, ব্যক্তি মানুষকে তার গোষ্ঠী জীবন থেকে বিচ্যুত করা, এটা বড়ই বেদনাদায়ক, এই বিচ্ছেদ বহুক্ষেত্রে কাম্য হলেও তা কম বেদনাদায়ক নয়। সদ্য-অভ্যুত্থিত এই ব্যক্তি মানুষ কখনই সুস্থ হয়ে উঠতে পারে না; তার বিস্ফোরণ সম্ভাবনাটুকু অক্ষুণ্ণ থাকে। পরিবার থেকে বিচ্যুত ভাগ্যান্বেষী যুবক যুবতী সম্বন্ধে একথা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি যুথবদ্ধ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, দল থেকে বহিষ্কৃত বা দলচ্যুত মানুষদের সম্বন্ধেও। সৈন্যবাহিনী থেকে যে সৈন্য খারিজ হয়ে গেছে অথবা যে ক্রীতদাসকে তার মালিক মুক্তি দিয়েছেন এবং যারা দাসগৃহ থেকে মুক্ত এদের সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। স্বাধীন এবং স্বপ্রধান অস্তিত্বটুকু বহন করতে হলে

নানাবিধ বিপদ ও ঝুঁকি নিতে হয় ; হরেক রকম ভয় এসে জড়ো হয় মানুষের মনে। কিন্তু এ সব সহজে সহ্য করা যায় যদি মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয়ের ভাব থাকে। মানুষের একটা বড় প্রয়োজন হল সে আপন মূল্যটুকুব স্বীকৃতি চায় অন্যের কাছ থেকে এবং ক্লান্তিহীন ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে সে এই স্বীকৃতিটুকু আদায় করে নিতে চায়। আপন আপন শক্তি সামর্থ্যকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে মানুষ আপনার মূল্যটুকুকে যাচাই করে নিতে চায়। অধিকাংশ লোকই কাজের মধ্য দিয়ে নিজের মূল্যটুকু জাহির করতে চায়। সার্থক জীবন এবং ব্যস্ত কর্মময় জীবন এরা নিকট প্রতিবেশী। ব্যক্তি মানুষ যখন আত্মোপলব্ধির পথে এগোয় অথবা আপন কর্মাদর্শের রূপায়ণে কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন সে বড়ই চঞ্চল ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। প্রতিদিন তাকে তার মূল্য যাচাই করে নিতে হয়, প্রমাণ করতে হয় যে তার উপযোগিতা রয়েছে। ভাগ্যবাদের আশ্রয় নিয়ে তাকে কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পডতে হয় না।

মার্টিন লুথার এবং ক্যালভিনের আবির্ভাবের পূর্বে এই কর্মোদ্যম ও কর্ম-চাঞ্চল্য পূর্ণমাত্রায় চলছিল ; সেটা ছিল রেনেসাঁসের কাল। যূথবদ্ধ, সমাজ-বদ্ধ মানুষ আপনার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যটুকু পুনরায় আবিষ্কার করছিল, একে ব্যক্তি মানুষের নব-জাগরণ বলা চলতে পারে। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধেই রিফরমেশন আন্দোলন মাথা তুলেছিল, এই আন্দোলনকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পুনরভ্যুদয়ের প্রতিক্রিয়া বলা চলতে পারে। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ব্যক্তি-তান্ত্রিক সমাজ-বিচ্ছিন্ন জীবনের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ভার বহনে অক্ষম। আত্ম-উন্নতির সুযোগ-সুবিধা যেক্ষেত্রে অল্প, সেক্ষেত্রে এই ভার বহন আরও অসহ্য হয়ে পড়ে। তখন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এরা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জীবনচর্চা পরিত্যাগ করে কোন ধর্মীয় আদর্শ, ধর্মীয় নেতা, অথবা আন্দোলনকে আশ্রয় করে আপন আপন সার্থকতা খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। আত্ম-প্রত্যয় এবং নিজের প্রতি শ্রদ্ধা এ দুটির বিকল্প হিসেবে এরা নতুন আশ্রয়ে আস্থা স্থাপন করে এবং তার জন্য কিছুটা গর্ববোধও করে। স্বপ্রধান, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অস্তিত্বের বিকল্প হিসাবে রিফরমেশন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল।

লুথার ও ক্যালভিন প্রভুত্বপরায়ণ চার্চের কবল থেকে ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দিতে চায়নি। ম্যাক্স বেবার বলেছেন যে রিফরমেশন আন্দোলনের

ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন চার্চের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিল, এ কথা ঠিক নয়। এই আন্দোলনের ফলে এক নতুন ধরনের প্রভাবের পত্তন হল। পুরানো প্রভাবটুকু অত্যন্ত শিথিল হযে পড়েছিল; মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চার মধ্যে এ প্রভাবটুকু অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং দুর্ভর হয়ে পড়েছিল। ব্যক্তি-জীবনে এবং সমাজ-জীবনের কোথাও এর ছায়াপাত ঘটেনি। জেনিভা এবং অন্যান্য দেশে প্রচারিত ক্যালভিন মতাদর্শ এবং তার বিধিবিধান ব্যক্তি-মানুষের স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, এ স্বাতন্ত্র্য শুধু ধর্মীয় নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষের স্বাতন্ত্র্যটুকুর বিরোধিতা করেছিল। হিটলার এবং স্তালিনের মত লুথার এবং ক্যালভিনেব হস্তে যদি জবরদস্তি করার শক্তিটুকু থাকত তা হলে তারা মানুষের নব-জাগ্রত স্বাতন্ত্র্যবোধটুকুকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ করে তুলত, সদ্যোজাত প্রতীচ্যের সূতিকাগারেই অপমৃত্যু ঘটত। কিন্তু ইউরোপের মানুষ রিফরমেশন আন্দোলনের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। আপন বিশ্বাসটুকুকে সে কর্মপ্রেরণারূপে ব্যবহার করেছিল, তার সাফল্যকে একটা বৈধরূপ দেবার চেষ্টা করেছিল আপন বিশ্বাসটুকুকে কাজে লাগিয়ে। সহস্রবিধ কর্মধারার চরিতার্থতায় সে আপন সার্থকতাটুকু চেয়েছিল। নতুন নতুন মহাদেশের নতুন নতুন বাণিজ্য পথের আবিষ্কার এবং নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ব্যক্তি-মানুষ নতুন সার্থকতার পথ খুঁজে পেলো। সে পৃথিবীর দিগ্বিদিকে ছুটে গেল, তার অশান্ত চরণেব গতি পৃথিবীব প্রশান্তিকে ব্যাহত করল। বিশ্ব-সংসার-অশান্ত উদ্বেল হয়ে উঠল।

বাইরের পর্যবেক্ষক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী সমাজ-ব্যবস্থায় একটা অদ্ভুত প্রবণতা লক্ষ্য করেন, তার নিত্যতরঙ্গিত আন্দোলনের ঢেউকে এরা পাশাপাশি বলে মনে করেন। এবং বস্তুতঃ কাজ হল ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়ার প্রতিষেধকমাত্র। ভারসাম্য হারিয়ে গেলে মানুষ যেমন হাত পা ছুড়ে সেই লুপ্ত ভারসাম্যটুকু ফিরে পায়, ঠিক তেমনি কাজের মধ্য দিয়ে সেই ভার-সাম্যটুকু ফিরে আসে। মানুষের ভারসাম্য হারিয়ে না গেলে সে কাজে আত্মনিয়োগ করে না। নেপোলিয়ঁ কার্নোকে লিখেছিলেন এক পত্রে: "যে কোন সরকারের নীতিই হবে মানুষকে অকাজের মধ্যে পচতে না দেওয়া"। তা যদি সত্য হয় তবে সরকারের কাজ হবে মানুষের মানসিক

ভারসাম্যটুকু নষ্ট করে দেওয়া। এ কথা শিল্প-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরো বেশী করে প্রযোজ্য; কেননা এই ধরণের সমাজব্যবস্থায় মানুষেরা বেশী মাত্রায় সচেতন ও কর্মতৎপর হয়। কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্রবাদী দেশগুলি এবং ব্যক্তি-তান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে মূল পার্থক্য হল কেমন করে তারা তাদের দেশের মানুষদের সক্রিয় এবং কর্মচঞ্চল করে রাখবে; অর্থাৎ এই ভারসাম্যের বিষয়টি কেমন করে ঘটাবে তা নিয়েই এই দুই মতবাদীদের বিরোধ।

কমিউনিস্টরা শুরু করল অঘটন-ঘটন-পটু কর্মী হিসেবে। মানুষ এবং তার সমাজের একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন তারা করতে চাইল; বড বড় দেশের আধুনিকীকরণ এবং শিল্পায়ন করে তারা এই আশ্চর্য পরিবর্তনটুকু আনতে চাইল। তাদের মতবাদের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে শক্তির উদ্ভব হবে সেই শক্তিই এই অসাধ্য সাধন করবে এবং যদি তা করে তবেই তাদের মতবাদের যাথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ হবে। যাদের আত্মবিশ্বাস কম তারা ধীরে সুস্থে পূর্বাপর বিবেচনা করে কুশলী কারিগরী শক্তি, কাঁচা মাল প্রভৃতির হিসাব নিয়ে তবেই কাজে হাত দেয়। এঁরা কিন্তু সে পথে না গিয়ে একেবারে সোজাসুজি ঝাঁপিয়ে পড়েন কাজের মধ্যে, বড় বড় পরিকল্পনায় হাত দেন দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং জাতীয় শক্তির অপচয়ের কথা একেবারে না ভেবেই। বিশ্বাস, আত্মোৎসর্গ এবং আত্মদান এই অসম্ভব সম্ভব করে। কর্ম-উন্মাদনার প্রসঙ্গে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথা হল কর্মোন্মাদনা ক্ষণস্থায়ী হয়; দীর্ঘমেয়াদী কর্ম-পরিচালনায় এ একেবারে অচল। প্রত্যয় ও আত্মদানকে পাথেয় করে যদি দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চালাতে হয় তাহলে এর চেয়ে একটা কম অস্বাস্থ্যকর ও অনপচয়ী অবস্থার কথা ভাবা শক্ত হয়ে ওঠে। মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে গেলে তার পরেও যদি তার কর্মোন্মাদনাটুকু বাঁচিয়ে রাখা যায়, তা হলে এর অত্যন্ত ক্ষতিকর পরিণতি হতে পারে। পুনর্জাগরণের, পুনরুজ্জীবনের জন্য বহু কাঠখড় পোড়াতে হবে, অনেক শক্তি অপচিত হবে। এবং যে জ্বালানি দিয়ে এই উন্মাদনার আগুনটুকু জ্বালিয়ে রাখতে হবে তা বহু ক্ষেত্রেই অত্যন্ত স্থূল এবং বিষময় ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। কমিউনিস্টরা প্রত্যয় এবং গগনচুম্বী আশা নিয়ে কাজে হাত দেয়; তা থেকে আত্মম্ভরিতা ও ঘৃণা জন্ম নেয় এবং

সব শেষে তা এক ধরনের ভীতিতে পরিণত হয়। মানুষকে উৎসাহী করে তুলতে কর্মোন্মাদ করে তুলতে স্তালিন ভীতিপ্রদর্শনের পথ বেছে নিয়েছিলেন, এটি একটি স্তালিনের বিষম বিষপ্রসূ উদ্ভাবন। মানুষের অন্তরাত্মাকে চূর্ণ করে দিয়ে তা থেকে শক্তি আহরণ তিনি করতে পেরেছিলেন, এ সাফল্য কম নয়।

অন্য ভাবেও কমিউনিস্টরা মানুষের মানসিক ভারসাম্যটুকু নষ্ট করতে পেরেছিলেন। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দেশের জনসমাজের একটা বৃহৎ অংশকে পাঠিয়ে দেওয়া, চাষীদের ধরে এনে শহরে বসিয়ে দেওয়া এবং শহরের লোকদেব নিয়ে গিয়ে গ্রামে বসিয়ে দেওয়া, এমনিধারা নানান পন্থা তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। মাঝে মাঝে কর্মকর্তাদের পদ থেকে খারিজ করে দেওয়া এবং সামগ্রিক কর্মনীতি হঠাৎ পরিবর্তন করে দেওয়া, এ সবের মধ্য দিয়ে তাঁরা সদা-সর্বদা দেশের জনগণকে সচেতন এবং উদগ্র করে রাখবার চেষ্টা করেছেন। তারা ঝিমিয়ে পডবাব অবকাশ পায়নি।

বিগত চল্লিশ বছর ধবে কমিউনিস্টরা যে শিল্পায়নের দিক থেকে প্রভূত উন্নতি করেছে, এ কথা সন্দেহাতীত। কিন্তু স্তালিনের জীবদ্দশায়ও বহু কমিউনিস্ট নেতাই এ কথা ভেবেছেন যে তাঁবা যে ভাবে দেশের মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে রেখেছেন তা মোটেই যন্ত্রযুগের লক্ষণ নয়। এ যুগের লক্ষণ চেষ্টাকৃত কর্ম-সম্পাদন নয়। কমিউনিস্ট কর্মসূচীর আকর্ষণপূর্ণ সম্ভাবনা থাকলেও এই মসৃণ নিরুদ্বেগ কর্ম সম্পাদনের কলকাঠি ওঁদের হাতে নেই। যন্ত্র চালু রাখতে যন্ত্রীকে যদি সব সময় কর্ণপটহবিদারী প্রচারের সাহায্য নিতে হয়, যদি তাকে সব সময় চাবুক উঁচিয়ে কর্মীদের কাজ করাতে হয় ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে, তবে নিশ্চয়ই তাঁরা যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কতগুলো যন্ত্র তাঁরা চালু করলেন এবং তাঁদের কুশলী আবিষ্কার কতখানি উঁচু দরের, এ সব প্রশ্ন অবান্তর ও অতিরিক্ত হয়ে পড়বে এই প্রসঙ্গে।

ব্যক্তি-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের মানসিক ভারসাম্যটুকু হরণ করা হয় আরো সূক্ষ্ম পন্থায়। বাইরে থেকে বিশেষ কোন নির্দেশ বা আদেশের প্রয়োজন হয় না এটুকু সম্পন্ন করার জন্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী মানুষেরা সর্বদাই তাদের ভারসাম্যটুকু হারিয়ে বসে আছে। আত্মপ্রত্যয় এবং নিজের

শক্তিতে আস্থা, এরা এই ভারসাম্যটুকু রক্ষা করে থাকে এবং এরা আবার অত্যন্ত সহজেই হারিয়ে যায়। এদের প্রতিদিন নতুন করে সৃষ্টি করতে হয়। আজকে যে কাজটা সুসম্পন্ন হল, কালকে তারই জন্য নতুন করে প্রতিদ্বন্দ্বে নামতে হয়। কাজের মধ্য দিয়েই প্রধানতঃ অধিকাংশ মানুষকেই আপনার মানসিক ভারসাম্যটুকু ফিরে পেতে হয় এবং আপনার মূল্য যাচাই করে নিতে হয়। তাই তারা সব সময়েই কর্মব্যস্ত। ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তাই কর্মচাঞ্চল্যের বিরতি নেই।

এ দাবি নিশ্চয়ই কেউ করবে না যে পশ্চিম দেশের অধিকাংশ মানুষেরা—তা তারা কর্মীই হোক আর কার্য-নির্বাহকই হোক—আপন আপন কর্মে আপনার পূর্ণতা খুঁজে পায়। কিন্তু এই কাজের মধ্য দিয়ে তারা বেঁচে থাকার অর্থটুকু খুঁজে পায়। সারাদিন ধরে কাজ করা এবং সেই কাজের মজুরি পাওয়া—এর মধ্যে মানুষ আপনার উপযোগিতা ও সার্থকতা খুঁজে পায়। মাহিনার অঙ্কে এবং লাভের হিসাবের মধ্যে এঁরা আনন্দের মূল্যায়নের নজীরটুকু প্রত্যক্ষ করে। যেক্ষেত্রে কর্মীর অসাধারণ নৈপুণ্য এবং শক্তির প্রয়োজন হয়, সেখানে কর্মী এক অপূর্ব আনন্দোন্মাদনার আস্বাদ পান। কিন্তু অতি সাধারণ দৈনন্দিন কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়েও কর্মী জীবিকা সংস্থান করা ছাড়াও এক ধরনের সন্তোষ লাভ করে।

পশ্চিম দেশের মানুষের চোখে কাজের যে কী মাহাত্ম্য তা বোঝা যাবে যদি আমরা বেকার লোকের মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা করি। বেকার মানুষের ব্যর্থতা বোধ তার আর্থনীতিক অসচ্ছলতার জন্য ঠিক ততটা নয়, যতটা তার নিজেকে অপদার্থ মনে করার জন্য। বেকার-ভাতা যতই দেওয়া হোক না কেন তা কখনই এর পরিপূরক হতে পারে না। পশ্চিম দেশে দারিদ্র্যের চেয়ে চুপ করে বসে থাকাই সব অসন্তোষের এবং অশান্তির মূলে রয়েছে। আমেরিকায় পুরো কাজ করার পরে অবসর গ্রহণের চিন্তাটাই যে কোন মানুষের পক্ষে একটা ভীষণ সমস্যার বস্তু। স্যানফ্রান্সিস্কো শহরের লংশোরম্যান্স ইউনিয়ন পঁয়ষট্টি বৎসর ও তদূর্ধ্ববয়স্ক ওয়াটার ফ্রণ্টের *

*Waterfront—নগর বা শহরের অংশ যেখানে জলের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

কর্মীদের পঁচিশ বৎসর চাকরির পরে মাসিক দুই শত ডলার পেন্সন দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন তখন দেখা গেল যে এই অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে মৃত্যু-হার হঠাৎ বেড়ে গেছে। এখন এ তত্ত্ব সর্বজনস্বীকৃত যে অবসর গ্রহণের জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে অবসরপ্রাপ্তকে তার প্রয়োজনীয় মানসিক স্থৈর্যটুকু দিতে হবে। হার্বার্ট হুভার তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে বললেন যে মানুষ অবসর গ্রহণ করলে সে পৃথিবীর সব মানুষের চোখে একটা উৎপাত ছাড়া আর কিছুই না। তাঁর এই কথাটা অনেকেরই মনের কথা এবং অনেকেই এটাকে সমর্থন করবেন।

কোন রকম চেষ্টা না করেই যাঁরা আত্মসম্ভ্রমটুকু সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন অর্থাৎ যাঁরা প্রায় এই আত্মসম্ভ্রমটুকু নিয়েই জন্মান, তাঁরা তেমন কাজে উৎসাহী বা তৎপর হয়ে ওঠেন না। তাই যে সমাজে নিগ্রোদের সরকারীভাবে হেয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে শ্বেতাঙ্গদের ভাবতে বাধা নেই যে তারা একটা উচ্চবর্ণের মানুষ। এরই ফলে শ্বেতাঙ্গরা-:কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এই ধরনের সমাজে তাই 'শ্বেতাঙ্গ অপদার্থদের' দেখা যায়। যে সব সমাজে জাতিভেদ আছে অথবা সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ আছে, সেখানে এই একই অবস্থা।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হল, পশ্চিমদেশের মানুষদের কর্মশক্তিকে তাদের কাজকে ভালোবাসার সঙ্গে সমার্থক ভাবলে ভুল ভাবা হবে। পশ্চিমী শ্রমজীবী যেন কাজকে আক্রমণ করে এবং কাজটা সুসম্পন্ন হলে ভাবে যে তার জয় হয়েছে। যারা নিগ্রোদের মত ভাবে যে কাজের আর শেষ নেই, তারা সহজ কাজকে গ্রহণ করতে পারে।

ব্যক্তি-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সব সময়েই কর্মমুখী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এই সমাজ ব্যবস্থায় বহুল পরিমাণে অনুসৃত হয়ে যায়। জনতার মধ্য থেকে, গোষ্ঠীর মধ্য থেকে ব্যক্তিমানুষটি কাজে আত্মনিয়োগ করে তার আপন মূল্য এবং উপযোগিতাটুকু সপ্রমাণ করার জন্য। গ্রীসের মত দেশে যেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যটুকু ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করা হত, সে দেশের কথা স্বতন্ত্র। ঐ স্বাতন্ত্র্যসমৃদ্ধ বিশেষ ব্যক্তিটি আপন মূল্য এবং উপযোগিতাটুকু সপ্রমাণ করার জন্য অন্যান্যদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে

চাইবেন অথবা আপনার শক্তি-সামর্থ্যটুকু দেখাতে চাইবেন অন্যদের। স্বপ্রধান ব্যক্তি কাজ, তা যতই কঠোর এবং নিরবিচ্ছিন্ন হোক্ না কেন, তার মধ্যে সেই আপন সমস্যাবলীর সমাধান করতে চায়। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে মানুষ এই সহজ পথটা বেছে নিয়ে তা অনুসরণ করে।

অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আস্থাবান সমাজ-ব্যবস্থাব কথা বলছি সে সমাজ-ব্যবস্থার সব মানুষই যে রুচিতে, বিচারে এবং মানস-প্রবণতায় অদ্বিতীয় এবং স্বতন্ত্র, তা নয়। এই ধরণের সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষ সুস্থ এবং স্বনির্ভর ; সে তার নিজেব জীবনের বৃত্তি নির্বাচন কবে আপন চেষ্টায়, এবং নিজে যে ভাবে আপনাকে গড়ে তোলে তার জন্য ভবিষ্যতের পূর্ণ দায়িত্বটুকু গ্রহণ করে। সুতরাং এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকলে তবেই মানুষ কর্মমুখী হয়ে ওঠে। এটা অবশ্য অদ্ভুত শোনাচ্ছে। এর অর্থ হল এই যে যখন আমরা কাজ করা অথবা না করার স্বাধীনতাটুকু মানুষকে দিই, তখন তারা এমন আচরণ করে যেন তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মানুষের শক্তির উৎসটুকু খুলে যায় যদি সে স্বাধীনভাবে কাজ কবতে পারে ; অবশ্য আনন্দে উচ্ছ্বাসে শুধু হৈ হৈ করলে এই শক্তির প্রস্রবণ বহমান হয় না। ভাবসাম্যটুকু বিনষ্ট না হলে এই শক্তি-উৎসেব মুক্তি ঘটে না। নির্বাধমুক্ত সমাজেও খোলামেলা নির্ভাবনা লোক বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। যখন আমরা মানুষকে তাব আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে ছেড়ে দিই, তখন তাকে এক ক্ষমাহীন মনিবের হাতে ছেড়ে দেওয়ার শামিল হয় ; তার হাত থেকে মানুষের সহজে মুক্তি ঘটে না। ব্যক্তি-মানুষ আপন আপন চেষ্টায় নিজ নিজ অস্তিত্বেব মর্যাদা রক্ষা কবতে গিয়ে নিজের কাছে নিজে চিরদিনের মত বাঁধা পড়ে থাকে।

ভারতবর্ষের অন্ধ্রপ্রদেশের শিল্প ও বাণিজ্য অধিকর্তা ১৯৫৮ সালে এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ চালনা করার চেয়েও দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দেওয়া অনেক বেশী শক্ত কাজ। আমাদের কানে কথাটা অদ্ভুত শোনালেও এর মূলে আপাত দৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হলেও একটা গভীর সত্য নিহিত আছে। সাম্প্রতিক

কালে সারা পৃথিবী জুড়েই বৈপ্লবিক সরকার গঠিত হয়েছে ; এই সব সরকার দেশের মানুষের ইচ্ছার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবুও এরা দেশের লোকেদের কাজে উদ্বুদ্ধ করে তোলবার মন্ত্রটি আয়ত্ত করতে পারেনি। সাধারণ মানুষের মনে উৎসাহ সঞ্চার করতে তারা জানে ; মানুষকে যুদ্ধে উদ্যোগী করে তুলতে তারা পারে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে করার জন্য মানুষের মনে একটা প্রেরণা সৃষ্টি করার ব্যাপারে তারা একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে। পরন্তু তারা অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, উঁচুদরের কারুকুশলী ও বুদ্ধিজীবীদের কাজের অনুকূল পরিবেশটুকু সহজেই রচনা করে দেয়, অত্যধিক জটিল কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ, এমন কী পরমাণুকে কাজে লাগানো এবং কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে চালনার জন্য প্রয়োজনীয় অসাধারণ কৌশলটুকুও তারা সহজেই মানুষের আয়ত্তে এনে দেয়, এতে তাদের কোন অসুবিধাই হয় না।

এই সব নতুন কমিউনিস্ট সরকারের নেতৃপদে যে সব বুদ্ধিজীবী রয়েছেন তাঁরা এ কথা বোধ হয় স্বীকার করবেন না যে জনসাধারণের কর্মমুখিতার সঙ্গে তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার একটা নিগূঢ় যোগ রয়েছে। এই ব্যক্তি-স্বাধীনতাই জনগণের কর্মশক্তির উদ্বোধন ঘটায়। এই যে বুদ্ধিজীবী মানুষের দল এরা পরিকল্পনা এবং জনগণের পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেছেন ; এঁদের কাছে এটা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয় যে জনগণকে নিজে নিজে কাজ করতে বললে তারা নিজের নিজের কাজে লেগে থাকবে।

এ সম্পর্কে মজার কথা হল এই যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে জনসাধারণ কাজে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু বুদ্ধিজীবী মানুষকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিয়ে তাকে সৃজনশীল হতে বললে সে যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিটুকু করতে পারবে, এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি না যে ব্যক্তিস্বাধীনতাটুকু দিলেই শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রে মানুষ সৃষ্টিশীল হয়ে উঠবে। কেননা আমরা জানি যে অতীতে এই সব ক্ষেত্রে যে সব উঁচুদরের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তার অধিকাংশই নির্বাধমুক্তির আবহাওয়ায় লালিত হয়নি। এ কথা সত্য যে আমাদের দেশে যে পরিমাণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে, সেই পরিমাণে কৃষ্টিগত সৃষ্টি-উৎকর্ষ লাভ করা যায়নি। সৃষ্টিশীল মানুষ সব সময়ে একটা নিরাপত্তার

অভাব বোধ করে; সে এমন একটা পরিবেশ চায় যে পরিবেশে তার অনন্যসাধারণতা এবং আত্মপ্রত্যয়টুকু কখনই ক্ষুণ্ণ হবে না। তার সৃষ্টির জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার চেয়েও বেশী দরকার তাকে বোঝা, তার সৃষ্টির সমঝদার হওয়া এবং তার কাজকে, তার শিল্পকর্মকে সপ্রশংস এবং সমৃদ্ধ দৃষ্টিতে দেখা। তাই স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র এই বুদ্ধিজীবীদের কাজের পথে অনুকূল হয়, কেননা এঁদের কাজের স্বীকৃতি এবং মূল্য এই ধরনের সমাজ-ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়। মুক্ত সমাজে, ব্যাপক ব্যক্তি-স্বাধীনতার জগতে এই বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কোলরিজ তাই প্রতিবাদের সুরে বলেছিলেন:

"ইংরেজ সরকারের চেয়ে ইউরোপের নিকটতম স্বৈরাচারী সরকার ও সুকুমার-কলার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য অনেক বেশী কাজ করেছে। জার্মানী এবং ইটালীতে একজন উৎকৃষ্ট গীতিকারের যথেষ্ট সম্মান; তারা তাদের সমাজের কাছে পরম আদরণীয়; চিত্রকর। স্থপতি এবং ভাস্কর এ সমাজের কাছ থেকে শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতির মর্যাদাটুকু লাভ করে।.. এদেশে সুকুমার-কলার জন্য সাধারণ মানুষের কোন শ্রদ্ধার বালাই নেই।" অবশ্য এ কথা ভাবতে বাধা নেই যে পুরোপুরি মুক্ত সমাজের সবাই এই ধরণের কলা-প্রীতিটুকু অর্জন করে নিতে পারবে। তবে এ পর্যন্ত আমরা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি তাতে বলা চলে যে এই ধরনের সমাজ-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জন্য যথেষ্ট স্থান থাকলেও লেখক শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবী মানুষের জন্য বিশেষ কোন শ্রদ্ধা বা মর্যাদার স্থান নেই।

একথা অদ্ভুত শোনালেও নিঃসন্দেহে সত্য যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিজীবী মানুষেরা নেতৃত্ব করলেও স্বাধীন, মুক্ত সমাজে তাঁরা খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। নিঃসন্দেহে তাঁদের উপযোগিতাটুকু কেউই স্বীকার করে না; তাঁদের প্রতিভার বিকাশের যোগ্য পরিবেশটুকুও এই ধরনের সমাজব্যবস্থায় তাঁরা খুঁজে পান না। তাই জন্য তাঁরা যখন গতানুগতিক সমাজব্যবস্থার অচলায়তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন তখন তাঁদের কথার সঙ্গে, ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরে তাঁদের কাজের অনেক বিরোধ থেকে যায়। তাই আমরা বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষ্য করছি কীভাবে আদর্শবাদী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা প্রবর্তিত এবং লালিত বিপ্লব আন্দোলন ক্রমে স্তরাশ্রিত সমাজব্যবস্থার পতন করে; এই ব্যবস্থায় অভিজাত

বুদ্ধিজীবীর দল জনগণকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এই ধরনের সমাজব্যবস্থার বুদ্ধিজীবীরা আপনার কাজের জন্য অনুকুল পরিবেশটুকু পান, কিন্তু সাধারণ মানুষেরা তা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই দেখি অনুরূপ অবস্থায় আদর্শবাদী বুদ্ধিজীবী মানুষেরা ক্রমে অত্যাচারী দাস-নিয়ন্তা রূপে গড়ে ওঠেন। তাঁরা অবস্থার বৈগুণ্যে এইভাবে গড়ে ওঠেন। শক্তি তাঁদের এই অধঃপতনটুকু ঘটায় না।

এখন মূল প্রশ্নটি হল এই যে, স্বাধীনতা সমৃদ্ধ জনগণ যখন কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে তখন তাঁরা নিজে নিজে আপনাদের কর্মাদর্শ সৃষ্টি করতে পারে কিনা? যদিও জনগণের সঙ্গে আমাদের যোগ অনাদিকাল থেকে; তবুও ও তাঁদের সৃষ্টি সম্ভাবনা সম্বন্ধে আজো খুব বেশী কিছু জানি না। ইতিহাসের পঞ্চাশটি শতকের মধ্যে কেবল মাত্র একবারই তারা নেতৃত্ববিহীন ভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল; এবং তাও সম্ভব হয়েছিল একটা নতুন মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়েছিল বলেই। জর্জেস বার্ণানোজ তাঁর লাস্ট অ্যাসেজ-এ বললেন যে ফরাসী সাম্রাজ্য জনসাধারণের চেষ্টায় স্থাপিত হয়নি; একদল মুষ্টিমেয় বীর যোদ্ধাই এই সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিল। একথাও একই ভাবে সত্য যে জনগণ ব্রিটিশ জার্মান, রুশীয়, চৈনিক অথবা জাপানী সাম্রাজ্যের কোনটারই পত্তন করে নি। কিন্তু আমেরিকার সৃষ্টি হল তার জনগণের কীর্তি। তারাই হল পথিকৃৎ। তারা দেশত্যাগ করে নতুন মহাদেশে একে একে এসেছিল। ঠেলাঠেলি মারামারি করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। একটা নতুন দেশের পত্তন করল, নিজেদের পতাকা উড়িয়ে দিল নীল আকাশে:

ওরা যাদের স্বীকার করল না।
সেই ভাগ্যহত দুঃখী মানুষেরা
সমুদ্র পার হয়ে এসো,
তারা চুপিসারে জিতে নিল
একটা গোটা মহাদেশকে;
তাদের পরিধেয়—
উত্তরীয়, আর সম্মান,
দুটোরই অভাব ছিল।

এই সত্যটুকুই আমেরিকাকে তার অভূতপূর্ব নূতনত্বটুকু দান করল।

আমরা যতদূর জানি, পৃথিবীর সকল সভ্যতার পত্তনের মূলে ছিলেন, রাজা, অভিজাত শ্রেণী এবং যাজক সম্প্রদায় প্রমুখ সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীর দল। এরাই জনগণের কাছে আদর্শগুলি তুলে ধরেছেন, তাদের আশায় আকাঙ্ক্ষা এবং মূল্যবোধটুকু নিয়ন্ত্রিত করেছেন। সাধারণ মানুষের রুচি এবং মূল্যমানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একমাত্র আমেরিকার সভ্যতা ; তাব রূপ ও রং সাধারণ মানুষের অবদান। আমেরিকায় কোন বুদ্ধিজীবী সম্ভ্রান্ত মানুষ পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারেন না ; একথা যেমন সত্য বুলীন অভিজাত সম্বন্ধে, তেমনি তা সত্য, বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত রণকুশলী সেনাপতি, কোটিপতি শিল্পপতি এবং স্বপ্রতিষ্ঠ শ্রমিক-নেতা সম্বন্ধেও।

যাঁরা আমেরিকার নিন্দুক তাঁরা বলেন যে আমেরিকার সভ্যতা হল বেনিয়া সভ্যতা। বস্তুতঃ এই বৈগুণ্যটুকু জনগণের ত্রুটির জন্যই ঘটেছে। পরিমাণগত এবং গুণগত অভিব্যক্তির সমীকরণ এরা কবেছে, এরা কাজ পাগল, কর্মে সামান্যই এদের লক্ষ্য ; কাজ কাজ করে এরা তুচ্ছতম বিষয়কেও মূল্য দেয়। এ হল এদের দোষের মধ্যে। গুণের মধ্যে হল এদের দুরন্ত জঙ্গমতা, এরা সকল কাজেই তাদের অসাধারণ পারদর্শিতাটুকু দেখায়। সাংগঠনিক প্রতিভা, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে শক্তি, যে কোন ধরনের পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া, সর্দারি না করে সঙ্গীদের দিয়ে কাজ করানো এবং বন্ধুত্ব করার অপরিমেয় শক্তি এ সবই হল আমেরিকাবাসীদের গুণের মধ্যে।

এ হল তাদের দোষ-গুণেব কথা। তাদের সৃষ্টি সম্ভাবনার কথা বলি। আমার মনে হয়, এই যে মানুষগুলির সঙ্গে আমি বাস করি, একসঙ্গে কাজ করি এদের প্রতিভা আছে। সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে আমাদের এতোখানি প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই যাতে করে আমরা বলতে পারি যে সৃষ্টিক্রিয়ার জন্য স্রষ্টার মধ্যে একটা অনন্যসাধারণ বোধ থাকা দরকার। যাঁরা নিজেদের অনন্যসাধারণ মনে করেন আমেরিকার লোকেরা তাঁদের সন্দেহের চক্ষে দেখলেও এর উৎকর্ষের প্রতি বিরূপ নয়। সপ্তদশ শতকে ফরাসী পণ্ডিতেরা যে ভাবে তাঁদের তত্ত্ব এবং পরিচয়গুলির সম্মার্জন করত ঠিক তেমনি করে আমেরিকার লোকেরা তাদের কাজ এবং অকাঙ্ক্ষ করার রীতিপদ্ধতিগুলিকে ঘষে মেজে উজ্জ্বল ক'রে তোলে। কল্প-

কারখানার কাজে এবং খেলাধুলায় যে ধরনের কুশলী নিপুণতা ব্যাপক-ভাবে জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে, ঠিক তেমনি ভাবে সাহিত্য, ফিল্ম, সংগীত এবং বিজ্ঞানেও জনসাধারণকে নৈপুণ্য অর্জন করতে হবে; এই অর্জন সম্ভাবনাটুকুর ওপরই জনগণের সৃষ্টি সম্ভাবনা সত্য হয়ে ওঠা একান্তভাবে নির্ভরশীল।

অতীতের নজীর থেকে আমরা একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করতে পারি—যেক্ষেত্রে জনগণ সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকর্মের সক্রিয় শরিক হয়ে উঠেছিল; তারা কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় দর্শকই থাকেনি। আমরা জানি যে রেনেসাঁসের সময় ফ্লোরেন্স নগরীতে সাধারণ নাগরিকের চেয়ে শিল্পীরাই সংখ্যায় বেশী ছিলেন। কোথা থেকে এতো শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল? নতুন ধরনের চিত্রাঙ্কন এবং ভাস্কর্য রীতির উদ্ভাবনে কারুশিল্পীদের এবং তাঁদের কারখানা ঘরের প্রভাব কম ছিল না। রেনেসাঁসের জন্ম হয়েছিল হাটে-বাজারে। সব বড় বড় শিল্পীরাই ছেলেবেলায় শিক্ষানবিসি করেছেন নামকরা মিস্ত্রি আর কারুশিল্পীদের কাছে। মিস্ত্রি, দোকানদার, চাষী এবং মধ্যবিত্ত চাকুরে শ্রেণীর মানুষের ঘর থেকেই এই সব বড় বড় শিল্পীরা এসেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বেনেদিত্তো ভারচি ফ্লোরেন্সবাসীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন:

'বাল্যকাল থেকেই এরা ভারী ভারী পশমের বোঝা এবং ঝুড়ি ঝুড়ি রেশমী কাপড় বইতে অভ্যস্ত। এরা সারাদিনমান এবং অনেক রাত পর্য্যন্তও তাঁত ঘরে কাজ করেন। এই সব মেহনতী মানুষদের মধ্যে যে উচ্চ এবং মহৎ চিন্তার এবং ভাবাদর্শের সন্ধান পেয়েছি তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি।'

শিল্পকলার রীতি-নীতির প্রতি যে তাদের একটা আত্যন্তিক আকর্ষণ ছিল, তা অতি-প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রীতি-পদ্ধতির ভিতরে। মার্সেল দুচাম্প বলেছিলেন: 'শিল্পমূল্যমান নেমে যাওয়ার ফলে যখন সাধারণ মানুষ চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা করেন, তখন সেই শিল্প সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহই থাকে না।" ফ্লোরেন্সের সব বড় বড় চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কররা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন; জীবনের ব্যবহারিক দিকটাকে তাঁরা অথবা প্রাচীন গ্রীসের এবং এযুগের শিল্পীদের মত অবহেলা করেননি। ভেরোসিও, আলবার্তি এবং লিওনর্দো দা ভিঞ্চি প্রমুখ শিল্পীদের কল-কব্জা যন্ত্রপাতির ব্যাপারে খুবই আগ্রহ

ছিল। ব্যবসায়ী এবং কারুকুশলীদের মতই এরা বস্তুতান্ত্রিক ব্যাপারে আগ্রহশীল ছিলেন ; এদের মতই এঁরাও খুঁতখুঁতে ছিলেন না। আপেক্ষিক স্থূল জীবনের কর্মোদ্যম, উৎসাহ এবং প্রবৃত্তির সঙ্গে শিল্প-সৃষ্টির সৌকর্যের একটা অহি-নকুল সম্পর্ক রয়েছে, এমন কথা ভাববার কারণ ছিল না।

ক্ষুদ্র ফ্লোরেন্স নগরীর শিক্ষাটুকু লক্ষ লক্ষ নরনারী অধ্যুষিত একটি বিরাট দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য হবে কিনা, সে সম্বন্ধে স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু এ কথা সত্য বলে মনে হয় যে কারখানার লেনদেনের আবহাওয়ায় সাধারণ মানুষের শিল্প-সৃজনক্ষমতা উদ্বোধিত হয়। শিল্পীগোষ্ঠীর দুর্লভ পরিবেশে এর উদ্বোধন তেমন ঘটে না। আমরা এ তত্ত্ব অনতিবিলম্বে অনুধাবন করব যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ সাধারণ মানুষের হাতে অবকাশের প্রাচুর্য এনে দেবে এবং এর ফলে তারা সৃষ্টিধর্মী কাজে হাত দিতে পারবে। ফলে, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষিত হবে, সমাজ সুস্থদেহী হয়ে উঠবে। এরা ততই সৃষ্টিধর্মী কাজে এগিয়ে আসবে যে অনুপাতে আমরা এদের সৃষ্টিশীল কারিগর করে তুলতে চাইব। সাহিত্যিক এবং শিল্পী করে তুলতে চাইলে তেমন সুফল পাওয়া যাবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ

সাধারণ মানুষের মুখপাত্ররূপে বুদ্ধিজীবীর অভ্যুদয় ঘটেছে সম্প্রতি কালে। আমরা শিক্ষা পেলেও অশিক্ষিত মানুষদের জন্য আমাদের কোন রকম উদ্বেগ থাকে না। যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন তাঁরা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন অশিক্ষিত মানুষদের থেকে দূরত্বটুকু বজায় রেখে। উৎকৃষ্ট লেখাপড়ার কাজ দেখিয়ে তাঁরা এই স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখতে আগ্রহশীল নন। একজন আমেরিকান ধর্মযাজক একবার গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন : "কোন ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বেশী উদ্বেগ বোধ করেন ?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "শিক্ষিত পাষাণ কঠোরতাকে।"

আমরা যে সব সভ্যতার কথা জানি তার প্রায় সবগুলিতেই লক্ষ্য করেছি যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হয় সেখানে শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অথবা তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেছে ; ফলে সাধারণ মানুষের ভাগ্য সম্বন্ধে তারা সব সময়ে উদাসীন থেকেছে। প্রাচীন মিশরে এবং চীনদেশে আমরা দেখেছি যে এই শিক্ষিত সমাজ প্রশাসক, কর-সংগ্রাহক, সচিব প্রভৃতি সকল রকমের সরকারী কাজে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। এঁরা হুকুম দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছেন ; কিন্তু নিম্নতর স্তরের লোকেদের সাহায্যের জন্য কখনো অনুমাত্র চেষ্টাও করেননি। ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবীরা হলেন সর্বোচ্চ বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণেরা। গৌতম বুদ্ধ সেবার মন্ত্র প্রচার করেছিলেন ; তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। জন্মগত পেশার বিচারে তিনি যোদ্ধা ছিলেন ; তিনি বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। আর বুদ্ধের শিক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাইলেন অপর এক যোদ্ধা ; তিনি হলেন সম্রাট অশোক। বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবকে সমর্থন ত জানালেনই না পরন্তু তাঁর বিরোধিতা করে বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষের সীমানার বাইরে বার করে দিলেন। প্রাচীন গ্রীসদেশে সামাজিক-স্তর-পর্যায়ের সর্বোচ্চে ছিলেন এই বুদ্ধিজীবীর দল ; কবি এবং দার্শনিকেরা ছিলেন আইনপ্রণেতা, রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং সমর-নায়ক। এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সাধারণ মানুষকে ঘৃণা করত ; এই ঘৃণা

ছিল তাঁদের চরিত্রের অঙ্গীভূত। এরাই সবটুকু কায়িক পরিশ্রমের ভার বহন করলেও এদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যে গ্রীক এবং রোমক বুদ্ধিজীবীর দল আপন কার্য সিদ্ধির জন্য শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন; সাধারণ মানুষ থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি করে তারা আপন গণ্ডীতে বাস করত। মধ্যযুগীয় ইউরোপে বুদ্ধিজীবীরা যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল; তারা বিশেষ সুবিধা পেতো; বঞ্চিত মানুষদের জন্য তাদের বিশেষ কোন মাথাব্যথা ছিল না।

আধুনিক ইউরোপের অভ্যুত্থানের পূর্বে আমরা মাত্র একটা দেশে এই দুর্বল মানুষদের স্বপক্ষে একদল মানুষকে ওকালতি করতে শুনেছি। এঁরা হলেন এক কথার মানুষ; যা বলেন তাই করেন। ভূমধ্যসাগরের পুর্ব উপকূলে এক সুপ্রাচীন ইহুদী জাতির বাস। বহু শতাব্দী ধরে সমাজ-সংস্থা এদের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক জীবন, এসবই এদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষদের মতই ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টপুর্ব অষ্টম শতকে কতকগুলি অজ্ঞাত কারণে এরা অদ্ভুতভাবে পাল্টে যেতে লাগল। পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, লেখক, উপদেষ্টা প্রমুখ প্রথাগত বাক্‌পটু মানুষদের পাশে পাশে গড়ে উঠল আর এক অসাধারণ মানুষের গোষ্ঠী। এরা বুদ্ধিজীবী শাসকগোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী; এই ভাববাদীর এযুগের উগ্র বুদ্ধিজীবীদের আদিরূপ রেণান এদের বলেছেন 'মুক্তাঙ্গন সংবাদপত্রসেবী', এঁরা রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, শহরের তোরণ দ্বারে দাঁড়িয়ে আপন আপন নিবন্ধ আবৃত্তি শোনাতেন। খ্রীষ্টপুর্ব অষ্টম শতকে এমন তাঁর প্রবন্ধ লিখলেন, আপোষহীন সংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই প্রথম নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের অনেক লক্ষণই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মতই এঁরা যে দলে যোগ দিতেন, সেই দলকেই 'আদিষ্ট গোষ্ঠী' বলে মনে করতেন; যে সত্য এঁরা গ্রহণ করতেন, সেই সত্যই একমাত্র সত্য ব'লে গৃহীত হতো। পৃথিবীতে একদিন স্বর্গরাজ্য নেমে আসবে—এ তত্ত্বে এই ভাববাদীরা বিশ্বাস করতেন। আজকের বুদ্ধিজীবীরা যে আদর্শ, যে ভগবন্মুখী উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের কথা বলছেন, তার কথা আমরা তখন শুনেছি যখন এই সব ভাববাদীরা কর্মতৎপর হয়েছিলেন প্রায় তিনশ বছর ধরে।

সেই দূর কালের কথা আমবা বিশেষ কিছুই জানি না বলেই, এই ভাব-

বাদীদের অভ্যুদয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। আধুনিক প্রতীচ্যে যে অবস্থায় এই বাক্‌পটু উগ্র বুদ্ধিজীবীদের অভ্যুদয় ঘটেছে, সেই ধরনের বিশেষ অবস্থাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভাববাদীদের অভ্যুদয়টুকুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা অত্যন্ত স্বাভাবিক। খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকে যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল ; তা হয়ত এঁদের আবির্ভাবের অন্যতম হেতু। এই সময়েই মিশরীয়দের জটিল এবং দুবোধ্য চিত্রলিপির বদলে সহজ সরল বর্ণমালার উদ্ভাবন করলেন ফিনিশীয় বণিক সম্প্রদায়। ফিনিশীয় এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে তৎকালীন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথাটা মনে রাখলে, এটা আমরা সহজেই বুঝতে পারব যে ইহুদীরা ফিনিশীয়দের কাছ থেকে এই সকল বর্ণমালা আয়ত্ত করে নিয়েছিল। বিশেষ করে রাজা সলোমিনের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টপূর্ব ৯৬০— ৯২৫ অব্দ) এই যোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ; তাঁর কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বহু শিক্ষিত ইহুদীর প্রয়োজন হয়েছিল ; এঁরাই তাঁর শাসনব্যবস্থায় করণিকের কাজ করত। শিক্ষার এই বিস্তারের প্রতিক্রিয়া ইহুদী সমাজের ওপর দেখা গিয়েছিল। ফিনিশিয়ায় যে নতুন অক্ষর এবং লিপির আবিষ্কার হ ল তা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক হল। এই নতুন শিক্ষিত মানুষদের দূরবিস্তৃত বাণিজ্য এবং ব্যবসা কেন্দ্রগুলিতে কাজ দেওয়া হ'ল, সুতরাং কোন সমস্যার উদ্ভব হল না। কিন্তু কৃষিকেন্দ্রিক ইহুদী সমাজে বেকার সমস্যা দেখা দিল। শিক্ষিত করণিকেরা বেকার হয়ে পড়ল, কেননা রাজা সলোমনের মৃত্যুর পরে তাঁর কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পডল। এই শিক্ষিত বেকারদের একদিকে রইল সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীর দল অন্যদিকে রইল অশিক্ষিত জনগণ। এই বুদ্ধিজীবীদের লেখাপড়ার একচেটিয়া অধিকারটুকু এরা কেড়ে নিয়েছিল ; এই অশিক্ষিত বৃহৎ জনগণের সঙ্গে এদের যোগটুকু ছিল জন্মসূত্রে। এদের কাজ ছিল না, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল না ; তাই এরা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠাবান বিত্তশালীদের বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠল। এরা এদের মূক অবহেলিত দেশবাসীদের মুখপাত্র হয়ে উঠল। এমস প্রমুখ প্রথম ভাববাদীদের অভ্যুদয়. কালে এই ধরনের অবস্থা ছিল বলে মনে হয়। এঁরা পথিকৃৎ ; পরবর্তী যুগে সর্বশ্রেণীর নরনারীরা এঁদের অনুসরণ করেছিলেন ; অভিজাত আইজেইয়াও এর ব্যতিক্রম হননি।

প্রতীচ্যে উগ্র বুদ্ধিজীবীর যে অভ্যুদয় ঘটল তার মূলে ছিল কাগজ ও ছাপাখানার আবিষ্কার প্রবর্ত্তন, লিপিকলার সরলীকরণের ফলে এটা সম্ভব হয়নি। আমরা পূর্বেই বলেছি যে যাজক সম্প্রদায় শিক্ষাকে যে কুক্ষিগত করে রেখেছিল তার অবসান ঘটল মধ্যযুগের শেষ ভাগে এবং কাগজ ও ছাপা-খানার প্রবর্তন এই একচেটিয়া অধিকারকে বিলুপ্ত করে দিল। বাক্‌পটু এই নব-অভ্যুদিত সম্প্রদায় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের মানুষদের মতই, কোন দলভুক্ত হয়নি; যাজক সম্প্রদায় অথবা শাসকগোষ্ঠী, এদের উভয়কেই ওরা পরিহার করে চলেছিল। এদের কোন সুস্পষ্ট পদমর্যাদা ছিল না; সামাজিক উপযোগিতার স্বতঃসিদ্ধ ভূমিকা এরা গ্রহণ করেনি। আধুনিক প্রতীচ্যে যে সমাজ-ব্যবস্থা উদ্বর্তিত হয়েছে সেখানে শক্তি এবং প্রভাব প্রতিপত্তি এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, জমিদার, সেনানী এবং মহাজনদের হাতে। বুদ্ধিজীবীরা মনে করে যে তারা এই ক্ষমতাসীন মানুষদের গণ্ডীর বাইবে পড়ে আছে। তার ভূরি ভূরি প্রশংসা করলে বা তাকে পুরস্কৃত করলেও সে মনে কবে না যে সে ক্ষুদ্র শাসকগোষ্ঠীর একজন। মূলতঃ তার নিজেব সৃষ্ট সভ্যতায় সে নিজেকে অবাস্তব, অতিরিক্ত মনে করে। তাই যারা ক্ষমতাসীন থাকেন তাঁদের যে এরা বহিরাগত বেদখলদার মনে করবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যে আমরা যে বিরোধ প্রত্যক্ষ করলাম তাহ'ল কথার লোক এবং কাজের লোকের মধ্যকার বিরোধ। এই বিরোধই ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারিত করে দিল এবং ইহুদীদেব একটা বিশেষ জাতিরূপে চিহ্নিত করে দিল। ষোড়শ শতাব্দীতে আধুনিক প্রতীচ্যের জীবনেও এই দ্বন্দ্ববিরোধ দেখা দিয়ে অন্যান্য সভ্যতা থেকে তাকে স্বতন্ত্র রূপ দিল। রিফরমেশন আন্দোলনের পর থেকে পশ্চিম এবং পশ্চিমের প্রভাব পরিমণ্ডলের মধ্যে যখনই কোন আন্দোলন হয়েছে, পরিবর্তন-কামী সেই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে এই নির্দলীয় বুদ্ধিজীবীর দল। কারণ তারা তখনই অনুসন্ধান করে ফিরেছে আপনার জন্য স্বীকৃতির মর্যাদাটুকু এবং এই ফলপ্রসূ সামাজিক ভূমিকা। যারা বঞ্চিত তাদের সঙ্গে যোগটুকু এরা রক্ষা করতে চেয়েছে; তা সে বঞ্চিতের দলে যারাই যাক না কেন—মধ্যবিত্ত, চাষী নীচশ্রেণীর মানুষ, উৎপীড়িত সংখ্যালঘু অথবা

উপনিবেশের অধিবাসীরা। এ পর্যন্ত তারা খুব জোরদার দোস্তি করেছে জনগণের সঙ্গে।

বুদ্ধিজীবী মানুষের সঙ্গে জনগণের এই মিতালি এক দুর্ভেদ্য আঁতাত সৃষ্টি করল এবং আধুনিক যুগে জনগণের অভূতপূর্ব অগ্রগতির মূলে রয়েছে এই মিতালিটুকু। এর সাথে অসাধ্য সাধন হ'লেও এই মিতালির মূলে কোন গভীর সম্বন্ধ নেই।

বুদ্ধিজীবী জনগণের কাছে যায় আপনার গুরুত্বটুকু খুঁজে পাবার জন্য, তার নেতৃত্বের ভূমিকাটুকু সে প্রত্যক্ষ করে এই জনগণের সংস্পর্শে এসে। কথার মানুষ যারা তারা আদর্শের সমর্থন এবং কথার জাদু মন্ত্রের সাহায্যটুকু চায়; এ ছাড়া তারা ফলপ্রসূ হতে পাবে না। এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে কাজের মানুষদের অনেক তফাৎ। বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব চায়, জয়ী হতে চায় সংগ্রামে, কিন্তু এই নেতৃত্ব করার কালে, এই জয়ের মুহূর্তে তার অনুভব করা চাই যে সে তার নিম্নতর প্রকৃতির বলবর্তী হয়ে এই কাজ করেনি। আপনার কথার সত্যতা প্রতিপালনের জন্য তারা বৃহৎ পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করে তোলে; এর দ্বারা তারা প্রতিপাদন করে যে তারা যা বলেছিল তা-ই সত্য হয়েছে। তাই তারা সর্বহারা বঞ্চিত ও অধঃপতিত মানুষদের জন্য সংগ্রাম করে; তাদের জন্য সুবিচার চায়। তাদের জন্য স্বাধীনতা, সাম্য এবং সত্যের পথ কামনা করে। কিন্তু বস্তুত পরে এ সম্বন্ধে থোরো যা বলেছেন তা যথার্থ। তিনি বললেন: বুদ্ধিজীবী যখন তার আপাতদৃষ্টিতে অনুগামীদের বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তখন সে প্রকৃতপক্ষে তার নিজের প্রতি কোন অবিচারের প্রতিবাদ করছে। যদিও বুদ্ধিজীবী মানুষ ভগবানের পবিত্রতম সন্তানও হন তবুও এ কথাই সত্যি।" তার ব্যক্তিগত অভিযানের ফয়সালা হলে বঞ্চিত মানুষদের জন্য তার সমবেদনা অনেক পরিমাণে কমে আসে।

তার মনের ছাঁচ হল অভিজাতসুলভ। হেরাক্লিটাসের মত সেও বিশ্বাস করে যে দশ হাজার সাধারণ মানুষের চেয়ে একজন প্রতিভাবান মানুষের দাম অনেক বেশী; 'অধিকাংশ মানুষই নীচ এবং মাত্র মুষ্টিমেয়

মানুষ মহৎ।" সে নিজেকে নেতা এবং 'মাষ্টার' বলে মনে করে।* এই বুদ্ধিজীবী মানুষেরা বিশ্বাস করে যে জনসাধারণ নিজে নিজে কোন বড় কাজই করতে পারে না; শুধু তাই নয়, যদি জনসাধারণ কোন কাজ করার চেষ্টা করে তা হলে তারা চটে যায়। জনসাধারণ শুধু হুকুম তামিল করবে। যুদ্ধের সময় এবং শান্তির সময় তাদের সুশৃঙ্খল পথে চালিত ক'রে তাদের সুস্থ করে তুলতে হবে। যে সমাজে সাধারণ মানুষকে তাদের ন্যায্য পাওনা দেওয়া হয়েছে সেখানে এই বুদ্ধিজীবী মানুষেরা মোটেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। যে দেশে মানুষের অভাব অভিযোগ নেই, সেখানে নেতৃত্বের অবকাশ সংকুচিত প্রাচুর্য-সমৃদ্ধ-সমাজে বুদ্ধিজীবীর আত্মপ্রসাদের ক্ষেত্র সংকুচিত হয় কেননা সেখানে মানুষেরা প্রাচুর্যের দম্ভ নিয়ে ঘোরে ফেরে; সম্পদের প্রচ্ছন্ন আস্ফালন বুদ্ধিজীবীর আভিজাত্যবোধকে আঘাত করে।

এর স্বপক্ষে অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যে উদগ্র বুদ্ধিজীবী যখন নিজের মনোমত সমাজ ব্যবস্থা (যে ব্যবস্থায় তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত, তার সামাজিক উপযোগিতা সর্বজনগ্রাহ্য) গড়ে তোলে, তখন জনগণ সম্পর্কে তার উজ্জ্বল ধারণা মলিন হতে আরম্ভ করে; সে তাদের নিন্দা করতে শুরু করে। তাদের অভাব অভিযোগের প্রবক্তার ভূমিকা সে পরিহার করে। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে ভাববাদীরা যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন তার সমাপ্তি ঘটল প্রায় তিনশো বছর পরে; বাক্‌পটু বুদ্ধিজীবীদের জয় হ'ল। ব্যাবিলনে বন্দীজীবন কাটিয়ে আসার পরে প্রাচীন ইহুদী সমাজে লেখক এবং পণ্ডিতেরা সার্বভৌম হয়ে বসলেন; ইহুদী জাতটা 'গ্রন্থাশ্রিত জাতি' বলে খ্যাতি লাভ করল। গোঁড়া ইহুদীদের মতই এই একদা প্রধান বুদ্ধিজীবী লেখকের জনগণের প্রতি তাদের বিরাগ প্রকাশে এতটুকু ইতস্ততঃ করল না। জনগণকে তারা নতুন নাম দিল 'আম হা আরেৎস'। এর দ্বারা জনগণের প্রতি তাদের তাচ্ছিল্যই প্রকাশ পেলে। ধার্মিক ছিলেন একথা প্রচার করলেন যে কোন 'আম হা-আরেৎস' কখনই পুণ্যাত্মা হ'তে পারে না। কিন্তু এরা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও তাদের ওপরে এদের প্রভাব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হ'ল না। গ্যালিলির উদার চেতা

১৯৩৫ সালে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র একটা বৈপ্লবিক সংস্থা গঠন করেন এবং নিজেদের নামের আগে 'থাকিন' (মাস্টার) কথাটি ব্যবহার করতে থাকেন।

সূত্রধর এই পাণ্ডিত্যাভিমানী বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। তিনি হতোদ্যম মানুষদের সমর্থনে এগিয়ে গেলেও আইনজ্ঞদের চুলচেরা বিচার পণ্ডিতম্মন্যদের অহমিকা এবং শাস্ত্রীদের পাণ্ডিত্যাভিমানের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। তিনি সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। একঘরে করে তাঁকে রাখা হয়েছিল। অ-ইহুদী মানুষদের মধ্যেই তাঁর অনুগামীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভাববাদীদের মতই যীশুখ্রীষ্টের মতাদর্শও যখন এই বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের হাতে এসে পড়ল তখন তাঁরা তা ব্যবহার করলেন, আপন আপন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ; বহু করণিককে কর্মসংস্থান ক'রে দেওয়া হ'ল। হতোদ্যম সাধারণ মানুষদের জন্য কিছুই করা হল না। তারা পৃথিবীর কর্তৃত্বভার পেলোনা ; জীবনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারময় গহ্বরে তারা দাসবৃত্তি অবলম্বন করল।

ষোড়শ শতাব্দীতে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। মার্টিন লুথার যখন পোপের নির্দেশের প্রতিবাদ করলেন তখন তিনি অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে 'দরিদ্র সাধারণ মানুষের' উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে জার্মান অভিজাত শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনিই বিদ্রোহী জনগণের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেছেন। তাঁর বিদ্বেষ অনুপম তীব্রতায় জনগণের বিরুদ্ধে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। তাঁর কথা উদ্ধৃত করি : "এর পুরোপুরি প্রতিবিধান করতে হবে! ওদের গলা কেটে দাও! ওদের বর্শা দিয়ে এ ফোঁড় ও ফোঁড় ক'রে দাও! ওদের উৎসাদন করতে সবটুকু চেষ্টা করতে হবে। একজন বিদ্রোহীকে হত্যা করা আর একটা পাগল কুকুরকে মেরে ফেলা একই কথা।" তিনি তাঁর অভিজাত পৃষ্ঠপোষকদের আশ্বাস দিয়ে বললেন। 'অন্যলোকে যেমন প্রার্থনা করে স্বর্গে যাবার পথ করে নেয় তার চেয়ে অনেক সুনিশ্চিত ভাবে রাজা বা রাজপুত্ররা শত্রু দমন করে স্বর্গরাজ্যে যেতে পারবে।'

সে যাই হোক, বিংশ শতাব্দীতে আমরা কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গীতে সব চেয়ে বেশী অসংগতি লক্ষ্য করেছি। সংগ্রামের সময়ে তাদের ভূমিকা যা থাকে, ঠিক সেই ভূমিকা তাদের আর থাকে না সংগ্রামে তারা জয়ী হ'লে। মার্ক্সীয় মতবাদ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অধঃপতন ও দাসত্ব থেকে জনগণকে এবং বুদ্ধিজীবী মানুষকে একই সঙ্গে বাঁচাতে চেয়েছিল। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-তে আমরা পড়েছি যে মেহনতী মানুষদের ন্যায্য পাওনা থেকে

বঞ্চিত ক'রে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের নিঃস্ব করে দিয়েছে। তারা অমানুষ, তারা দাসমাত্রে পরিণত হয়েছে। এই বুর্জোয়া সমাজ বুদ্ধিজীবীদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতেও অস্বীকার করেছে। 'যে সব উপজীবিকা এতো দিন সম্মান পেয়ে এসেছে, বুর্জোয়া সমাজ তাদের সে সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে।' যদিও সাম্যবাদ আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল। এই বুদ্ধিজীবীরা, তাদের বুদ্ধি এবং অভাববোধই এই আন্দোলনকে রূপ দিয়েছিল, তবুও শ্রমজীবী মানুষরাই এই আন্দোলনের মুখ্য নায়ক হয়ে উঠল। তারাই হ'ল বিপ্লবী ভাবাদর্শের বাহক; আসন্ন বিপ্লবের ফসলের উত্তরাধিকার তাদেরই দেওয়া হল। সমগ্র ঐতিহাসিক আন্দোলনটিকে বুদ্ধিগতভাবে যে সব বুদ্ধিজীবী মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাদের পথনিয়ন্তারূপে রাখা হয়েছিল। তারা যেন সব মজিজ-এর দল; মরুভূমিতে ভ্রমণকালে মজিজ-এর যে ভূমিকা ছিল, তাদেরও অনুরূপ ভূমিকা। একবার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারলে মজিজ-এর মতই এদেরও আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। লেনিন বলেছিলেন "বুদ্ধিজীবীর কাজ হ'ল এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে উদ্ভূত বিশেষ নেতৃত্বকে 'এই বাহু' করে দেওয়া।

বিগত চল্লিশ বছর ধ'রে মার্ক্সীয় আন্দোলন বিরাট পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে। এর ফলে বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের পত্তন হয়েছে; এলব থেকে চীন সমুদ্র পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডে এর আধিপত্য স্বীকৃত। রাশিয়া, চীন এবং আশেপাশের ছোট ছোট কয়েকটি রাষ্ট্রে মার্ক্সীয় বিপ্লব সংসাধিত হয়েছে। এখন দেখা যাক, এই সব দেশে জনগণের কী অবস্থা, বুদ্ধিজীবীরই বা অবস্থা কেমন?

অতীতে অথবা বর্তমানযুগে আমরা কোথাও বুদ্ধিজীবীদের এতো প্রাধান্য দেখিনি যেমনটি আজ আমরা দেখছি কমিউনিস্ট দেশগুলিতে। তার সামাজিক মর্যাদা স্বতঃসত্যে পরিণত হয়েছে; তার সামাজিক উপযোগিতা সর্বজনস্বীকৃত। যারা নিজেদের বুদ্ধিজীবী মনে করে তারাই আজ শাসনযন্ত্রের সর্ব বিভাগে ক্ষমতাসীন। উচ্চতম প্রশাসকের সম্মান দেওয়া হয়েছে লেখক, কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক এবং সাংবাদিক প্রমুখ বুদ্ধিজীবী মানুষদের। এরা আজ অভিজাত শ্রেণীর; এদের হাতে ধনসম্পদ, এরাই আজ অগ্রগণ্য; এদের খোশামোদ করা হয়, এদের বাহবা দেওয়া হয়,

বলা হয় তোমরা না হলে কাজ চলবে না। বাক্‌পটু বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যন্ততম স্বপ্নটুকু ও সত্য হয়ে উঠল।

বুদ্ধিজীবীর এই স্বর্গরাজ্যে জনগণের কী অবস্থা? জনগণ কাজ ঠিকমত করছে কী না তা দেখার ভার এই বুদ্ধিজীবীদের ওপর ন্যস্ত এবং ইতিহাসে এদের চেয়ে কঠোর পরিদর্শক বোধ হয় আর দেখা যায় নি। অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় বোধ হয় জনগণকে এতোখানি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বিচার করা হয়নি। সমাজ গঠনে জনগণকে কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, ইচ্ছামত এদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে, যুদ্ধ এবং শান্তির সময়েও বহু মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা এক অভিনব পন্থায় বলপ্রয়োগ করছেন। গতানুগতিক পথে প্রভু বশ্যতা স্বীকার করিয়েই বশীভূতকে ছেড়ে দেয়, কিন্তু এই বুদ্ধিজীবীরা তা করেন না। এঁরা তত্ত্বের সার্বভৌম শক্তিতে আস্থাবান; স্ব-গৃহীত সত্যে এঁদের অগাধ বিশ্বাস কেননা এই সত্য তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা শুধুমাত্র মৌখিক বশ্যতায় সন্তুষ্ট হন না। পিঠে হাত বুলিয়ে, অনেক বোঝানোর পরে আমরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করি কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা তা আশা করে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। ভীতিপ্রদর্শন করে এঁরা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়া মানুষগুলোর কাছ থেকে তাদের নতুন বিশ্বাস এবং আশ্বাসের কথা শুনতে চান।

এ সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে যে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জনগণের সহাবস্থানে অসংগতি রয়েছে। যে সমাজে রাজ-রাজড়া ধর্মযাজক ও মহাজনের আধিপত্য, সে সমাজে বুদ্ধিজীবীরও প্রাধান্য; যে সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের রুচিপ্রবৃত্তি এবং মূল্যবোধ অগ্রাধিকার পায়, সেখানে এরা অপ্রধান। ইতিহাসের পাদপ্রদীপের শাসনে যখন জনগণ এগিয়ে আসে, যখন তারা সংস্কৃতির মণিকোঠায় প্রবেশ করে তখন শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধিজীবী মানুষেরাও প্রমাদ গোণে। উত্তর আমেরিকায় যে গণ-সমাজব্যবস্থার পত্তন ঘটেছিল তা দেখে হাইনে শিউরে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন; 'ওখানে স্বাধীনতার নামে যে দানবীয় বন্দীশালা তৈরী হচ্ছে, তার অদৃশ্য বন্ধন আমার স্বদেশের দৃশ্যমান শৃঙ্খলের চেয়ে অনেক বেশী পীড়াদায়ক; সেখানে জনগণের

হাতে স্বৈরাচারী শাসন ক্ষমতা।" নীচে এই ভেবে ভীত হয়েছিলেন যে জনগণের অভ্যুদয় ইতিহাসের গতিপথকে অগভীর বদ্ধ জলাভূমিতে পরিণত করবে। কার্ল জ্যাসপারস বললেন যে জনগণের নিম্নাভিমুখী প্রচণ্ড মধ্যাকর্ষণের ফলে সমস্ত উর্ধ্বগতিই পঙ্গু হয়ে পড়ে। অতি সাধারণ শক্তির প্রচণ্ডতা যা কিছু অসাধারণ তাকে আঘাত করে। এমার্সনের মতে জনগণ হল অভাব্য। চলচ্ছক্তিহীন এবং অসংস্কৃত, এদের দাবি দাওয়া এবং প্রভাব প্রতিপত্তি দুটোই ক্ষতিকর। এদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে, খোসামোদ করে এদের মাথায় তোলা যুক্তিযুক্ত নয়। এদের কিছুই দেওয়া উচিত নয়।" এমার্সন চেয়েছেন এদের পোষ মানাতে, এদের ভদ্র করে তুলতে। এদের যুথভ্রষ্ট করে জনতার মধ্য থেকে ব্যক্তি মানুষটিকে সুস্থ এবং স্বপ্রতিষ্ঠ করতে চেয়েছিলেন তিনি।...জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলটুকু সরকারের আয়ত্তে আসুক, এটা ছিল তাঁর আশা। ফ্লবেয়ার জনগণের মধ্যে কোন আশার আলোক দেখতে পাননি। তাঁর মতে জনগণের বয়স কখনই বাড়ে না, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয় না; তারা সমাজের নীচের তলার মানুষ। তাঁর মতে চাষাভুষোর বর্ণপরিচয় জ্ঞান হলে তারা যদি পাদ্রী-পুরোহীতদের কথা না শোনে, তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। যেটা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটা হল রেনাঁ এবং লিটার প্রমুখ মনীষীদের বাঁচবার সুযোগ দিতে হবে। তাদের কথা-শুনতে হবে আমাদের।

প্রজ্ঞাবান মানবপ্রেমী রেনাঁও জনগণের প্রতি তাঁর বিরাগটুকু প্রকাশ করে ফেলেছেন। তাঁর মতে জনপ্রিয় গণশিক্ষা জনগণকে জ্ঞানী করে তোলে না। পরন্তু এই ধরনের শিক্ষার ফলে তাদের স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ এবং মৃদুস্বভাব, তাদের আত্যন্তিক বিচারবুদ্ধি, তাদের সহজাত সুকুমার বৃত্তিগুলিকে নষ্ট করে দিয়ে তাদের একেবারে অসহ্য ক'রে তোলে। ১৮৭০ সালের বিপর্যয়ের পরে রেনাঁ কয়েকমাস অজ্ঞাতবাস করলেন এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ফিলজফিক্যাল ডায়লগস্ লেখা হল। এই গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রধানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন নি, যদিও এরাই ফরাসীদের পরাজয়ের জন্য দায়ী। তিনি গণতন্ত্র এবং জনসাধারণের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে লিখলেন। জনগণের কল্যাণের মধ্যেই সমাজের সার্থকতা, এই নীতি প্রকৃতির নীতির সঙ্গে সংগত নয় বলেই তিনি মনে

করেছেন। এ সম্বন্ধে ভয়ের কারণ এই যে গণতন্ত্রের অন্তিম প্রকাশ ঘটতে পারে এমন এক সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে শুধুমাত্র অধঃপতিত জনগণের নিম্নমানের চাহিদা মেটানোই হ'বে সেই সমাজের একমাত্র লক্ষ্য। আদর্শ সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য হল অসাধারণ মানুষ সৃষ্টি করা, জনগণকে শিক্ষিত করা নয়। এই লক্ষ্যে পৌছানোর প্রাগাবস্থা যদি জনগণের অজ্ঞতাই হয়, তাহলে জনগণের পক্ষে তা নিন্দার কথা। জনগণকে পুরোপুরি আয়ত্তে না আনতে পারলে উন্নত ধরণের সাংস্কৃতি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে পৃথিবী শাসন করবেন জ্ঞানী-গুণী লোকেরা। তাদের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা দিতে হয় যাতে ক'রে তারা যেন জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারে; প্রয়োজন হলে তারা যেন নরককুণ্ড সৃষ্টি করতে পারে; এ নরক কাল্পনিক নরককুণ্ড নয়, এ নরক বাস্তব এবং সত্য। এর ফলে সৃষ্টি হবে প্রতিষেধক ত্রাস যেমনটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি স্তালিনের আমলে প্রায় ষাট বছর পরে। এই ত্রাসের রাজত্বে ভয়-ত্রস্ত মানুষ আত্মপক্ষ সমর্পণ করবে না। এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় শাসকেরা হয় এশিয়ার কোন এক নিভৃত অংশে বশ্‌কীর এবং কালমুকদের মত বিবেকহীন, বাধ্য এবং নৃশংস অনুচরদের লালন করবে যাতে ক'রে প্রয়োজন হ'লে সব রকমের নৃশংস নিষ্ঠুর কার্য্য এদের দিয়ে সম্পন্ন করানো যায়।

এটা খুবই লক্ষণীয় যে, ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির উপনিবেশের মানুষদের সম্বন্ধে যে ধরনের মনোভাব থাকে ঠিক সেই একই ধরনের মনোভাব (জনসাধারণের প্রতি) এই বুদ্ধিজীবী মানুষদের রয়েছে। সাদা চামড়ার মানুষদের বোঝার নীচে যেমন 'সাহেবরা' আর্ত চীৎকার করত ঠিক তেমনি ধারা বুদ্ধিজীবীরাও এই জনগণের অচলায়তনের নীচে চাপা পড়ে আর্তচীৎকার করে। তাই যখন আমরা পর্তুগাল অথবা রাশিয়ায় এই বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্য বলে শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করি, তখন আমরা ওখানে ওদের স্বদেশে এই উপনিবেশ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করি। এতে আমরা আশ্চর্য হই না যখন দেখি, উপনিবেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের ফলে শাসনক্ষমতা শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে কৃষ্ণাঙ্গ বুদ্ধিজীবীদের হাতে চলে গেল। এই কৃষ্ণাঙ্গ বুদ্ধিজীবীরাই এই আন্দোলনের অধিনায়কতা করেন।

"দি রেডিনেস টু ওয়ার্ক" (কর্মমুখীনতা) শীর্ষক নিবন্ধে একথা বলা

হয়েছে যে বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত সমাজ-ব্যবস্থায় জনগণ বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় কিছুটা বলপ্রয়োগ, কিছুটা স্বাধীনতাহরণ প্রয়োজন হয় জনগণকে ঠিকমত কাজ করানোর জন্য। যাইহোক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে হয়ত পরিণামে শাসকেরা জনগণের সাহায্য ছাড়াই দেশের আর্থনীতিক ব্যবস্থার চালনা করতে পারবেন। এখন একথা চিন্তা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে জনগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে পড়লে বুদ্ধিজীবী শাসকগোষ্ঠী এদের নিয়ে কী করবেন? আগামী দিনে কী ঘটবে সে সম্বন্ধে ডষ্টয়েভস্কির একটা অদ্ভুত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল; তারই ফলে লিয়ামশিন নামক তাঁরই সৃষ্টি একটা চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি এই কথাগুলি বসালেন:

"মানব সমাজের নয় দশমাংসকে নিয়ে যদি আমাদের কোন কাজ না চলে তা হলে তাদের স্বর্গরাজ্যে বসিয়ে রেখে না দিয়ে তাদের বোমা মেরে উড়িয়ে ধ্বংস করে দেবো। সামান্য কয়েকজন শিক্ষিত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখব যারা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করবে।" *

খুব বেপরোয়া বুদ্ধিজীবীরাও বোধ হয় লিয়ামশিন-এর সুপারিশ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন, অবশ্য মাও সে তুং বোধ হয় চীনা জনগণের ফালতু অংশটুকু ধ্বংস করতে চায় বলেই পারমাণবিক প্রলয় সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন নন। একথা ভাবতে বাধা নেই যে হয়ত পরিণামে এই ধরনের এক মতবাদ প্রবর্তিত হ'বে; যে বলবে, জনগণ হল বিষাক্ত আবর্জনার শামিল; তাই তাকে মুখবন্ধ পাত্রে বন্ধ ক'রে অস্পৃশ্যজ্ঞানে দূরে সরিয়ে রাখতে হ'বে। ১৯৫৩ সালের অভ্যুত্থানের পরে পূর্ব জার্মানীর কমিউনিস্ট মুখপাত্রেরা যে সব উক্তি করেছেন তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই ধরনের মতবাদ কমিউনিস্টদের শাসন-প্রবণতার খুব বিরোধী নয়। তাঁদের মতে বিদ্রোহী শ্রমিকেরা মার্কস্‌কথিত শ্রমিক শ্রেণী নয়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে এদের শ্রমিক বলেই মনে হয় এবং এদের ব্যবহারও শ্রমিকদের মতই। এরা হ'ল ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণী ও উপশ্রেণীর অসংস্কৃত মানুষদের একটা পাঁচমিশেলী জনসমাজমাত্র। এঁদের মতে যারা সত্যিকারের শ্রমিক তারা দায়িত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে

* দি পজেস্‌ড, মডার্ণ লাইব্রেরি সংস্করণ। (নিউইয়র্ক: রেণ্ডম হাউস্‌ ১৯৩৬) পৃঃ ৪১১

অধিষ্ঠিত। Bertoct Brecht রহস্যচ্ছলে বললেন যে যেহেতু কমিউনিস্ট সরকার জনগণের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন সুতরাং তাঁদের উচিত এই জনগণকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে নতুন জনগণের নির্বাচন করা।

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিজীবীরা কেবলমাত্র আর্থনীতিক ব্যাপারেই জনগণের ওপর নির্ভরশীল নয়; এই নির্ভরশীলতার উৎস রয়েছে অনেক গভীরে। বুদ্ধিজীবী সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চায় শ্রদ্ধা ও পূজা এবং এই বৃহৎ অসংবদ্ধ জনগণের কাছ থেকেই সে তা পেতে পারে। স্বয়ং ভগবানও মানুষকে সৃষ্টি না ক'রেও কাজ চালাতে পারতেন কিন্তু তিনিও এই পূজা, ভক্তি ও প্রার্থনাটুকু লাভ করার জন্য মনুষ্য সৃষ্টি করেছিলেন। বুদ্ধিজীবীরা কলহপরায়ণ ও কুৎসাপ্রবণ বুদ্ধিজীবীদের ওপর কর্তৃত্ব করতে চান না। জনগণের আস্থাই তাঁর আত্মবিশ্বাসটুকুকে দৃঢ়তর ও প্রাণবন্ত করে তোলে। হেরমান রশনিং একজন নাৎসী বুদ্ধিজীবীর কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন: "আমি যখন ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়ি, তখন দলীয় তর্কবিতর্কে আমি প্রায় পরাস্ত হয়ে পড়ি, তখন যদি আমি একটা জনসভায় গিয়ে এই সরল হৃদয়বান ও সৎ মানুষগুলির সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করি, তা হলে তখনি আমি চাঙ্গা হয়ে উঠি; আমার সব সন্দেহের নিরসন হয়।"

সংক্ষিপ্তসার: বুদ্ধিজীবী যখন জনকল্যাণের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন তখন বুঝতে হবে যে তিনি আপন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নন; নিজের সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে তার মনে সন্দেহ আছে। যে বুদ্ধিজীবী মানুষ নিরন্তর বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তার ক্রমাগত চেষ্টার ফলেই জনগণ তার প্রাপ্য অংশটুকু পেয়ে থাকে। বুদ্ধিজীবী যখন সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন সে শক্তির আধার হয়ে পড়ে; সে তখন দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের সঙ্গে হাত মেলাবার বহু মহৎ যুক্তি খুঁজে পায়।

অতএব জনগণের স্বার্থেই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর বোঝাপড়া না হওয়াই ভালো। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব যদি চলতে থাকে তা হ'লে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বুদ্ধিজীবীরা তাদের লক্ষ্যে পৌছুতে পারবে না। জনগণের শ্রেষ্ঠ অংশ হল এই বুদ্ধিজীবীরা এবং তারা যদি তাদের অভিলাষ পুর্ণ করতে না পারে, সেটাও সমর্থনযোগ্য নয়। এদিকে জনগণ ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিজীবী মানুষদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর বিরোধের ফলে জনগণের কল্যাণ সাধন অপেক্ষা আরো একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এর ফলে সমাজ-ব্যবস্থা তার গতিটুকু হারায় না। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে, যে সমাজে শিক্ষিত মানুষেরা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে গোড়া থেকেই যুক্ত সেক্ষেত্রে শুরুটা হয় খুব আড়ম্বর ক'রে। কিন্তু সমাজের ক্রমিক উন্নতি এবং বিস্তার আর ঘটে না। এই ধরনের সমাজ অল্প সময়ে উৎকর্ষের শিখরে ওঠে; তার পরে তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। এর ফলে এই ধরনের সমাজের ইতিহাস ক্রমাবণতি এবং স্থাবরতার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে পড়ে। এটা ঘটেছিল মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন প্রভৃতি প্রাচীনতম নদীমাতৃক সভ্যতাগুলিতে, ভারত, পারশ্য প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নবীন সভ্যতাগুলিতেও এটা ঘটেছে আর ঘটেছে গ্রীকো-রোমান জগতে বিজ্যানটিয়াম-এ এবং মুসলিম সভ্যতায়। আমরা এও দেখেছি যে অবক্ষয়ী সমাজের প্রথম জাগরণ ঘটে শিক্ষিত সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের সঙ্গে শাসক গোষ্ঠীর বিরোধের মধ্য দিয়ে; এটা প্রধাণতঃ সম্ভব হয় বিদেশী প্রভাবের ফলে। মধ্যযুগীয় অবক্ষয় থেকে ধীরে ধীরে ইউরোপ যখন আপনাকে মুক্ত করল তখন সেখানে এবং অন্যত্রও আমরা দেখেছি যে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে শাসক গোষ্ঠীর বিরোধ বেধেছে। বস্তুতঃ সকল নবজাগরণেব ক্ষেত্রেই এই বিরোধটুকু ঘটেছে।

বুদ্ধিজীবী মানুষ যে সৃজনশীল কর্মে আত্মনিয়োগ করেন তার মূলে প্রায়শঃই থাকে বিফল প্রয়াস। কল্যাণপ্রসূ কর্মে আত্মনিয়োগ না করতে পারলে এবং সামাজিক মর্যাদা না পেলে তখন বুদ্ধিজীবীরা সৃজনশিল্পী কর্মে আত্মনিয়োগ করে। দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হয়ে কাজে এগুতে না পারলে মনের শক্তি কেন্দ্রীভূত ক'রে তারা এই সৃষ্টিকর্ম করে। যারা সত্যিকারের লেখক, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক তাদের অন্তরে অসন্তোষের বহ্নি সদা ধূমায়িত। বিপ্লবীদের অসন্তোষ থেকে তাদের অসন্তোষের কোন প্রভেদ নেই, কেবল এই প্রভেদটুকু রয়েছে যে তারা এই অসন্তোষকে সৃষ্টিধর্মী কাজে রূপায়িত করতে পারে। সৃষ্টিমুখীনতা থেকে মানুষের শক্তিকে কর্মব্যস্ত সফল জীবনায়নে প্রবাহিত করে দিলে, যে অসন্তোষ থেকে সৃষ্টিকর্ম উৎসারিত হয় সেই অসন্তোষটুকু অন্তর্হিত হয়ে যায়।

এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, যে ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা পুরো কর্তৃত্বভার

পেয়েছেন সেখানে তাঁরা যথার্থ সৃষ্টির উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেন না। এর কারণ সেই সমাজে বুদ্ধিজীবীর ভেকধারী সৃজনীশক্তিহীন মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তারাই শাসনক্ষমতা দখল করে নেয় কেননা যারা সত্যিকারের সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীর দল, ক্ষমতা দখল রক্ষা এবং চালনা করা এ সবের কোনটা করারই মনোবৃত্তি তাদের নেই। তাই ভেকধারী বুদ্ধিজীবীরা ক্ষমতা দখল ক'রে সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা আপন অতি-সাধারণতা ও তুচ্ছতাটুকু অঙ্কিত করে দেয়। অধিকন্তু তার সৃষ্টিশক্তির অভাব তাকে পীড়া দেয়; এর ফলে তার মধ্যে সত্যিকারের বুদ্ধিজীবীদের উজ্জ্বল সৃষ্টি সম্ভাবনার প্রতি একটা মারাত্মক ঘৃণা জেগে ওঠে; তাই সে স্থূল হস্তাবলেপে সকল প্রকারের বুদ্ধিগত কাজকর্মকে সমান করে দেয়। স্তালিন এটি করেছিলেন।

. সুতরাং একথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, বুদ্ধিজীবী তার ক্ষমতা লাভের পিপাসা চরিতার্থ.করতে না পারার ফলে জনগণের কল্যাণ সাধনের চেয়ে একটা মহত্তের উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। অসন্তোষ সকল সৃষ্টি কর্মের মূলে থাকার ফলে জনগণের কল্যাণ হয়ত সাধিত হচ্ছে; সৃজনধর্মী মানুষ কাজের মধ্যে সাফল্য না পেয়ে সৃষ্টিকর্মে তাকে সত্য ক'রে তোলে; তার শক্তি, তার প্রতিভা অবিশ্রাম সৃষ্টিকর্মে ·সেইটুকু পুরণ করে তোলে, যা সে পুর্ণ করতে পারেনি কাজের মধ্য দিয়ে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্যবহারিক বুদ্ধি

আজকের দিনে আমরা ব্যবহারিক মনোবৃত্তিকে সবাই স্বীকার করে নিয়েছি। আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং কাজের সুবিধার জন্য প্রথম সকল মানুষের মধ্যেই উপায় এবং অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার দিকে একটা ঝোঁক আছে বলে আমরা মনে করি। একটু চিন্তা করলেই কিন্তু আমরা এ কথা বুঝতে পারি যে ব্যবহারিক বুদ্ধি একটি দুর্লভ বস্তু; এটা মোটেই একটি স্বাভাবিক গুণ নয়। ইতিহাসে এর দেখা ক্বচিৎ মেলে। প্রতীচ্যে এটার দেখা পাওয়া যায় বটে তবে তা বিগত দু'শো বছরেই সুপ্রকট হয়ে উঠেছে।

নিওলিথিক যুগের শেষ পর্বে (৪০০০-৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) নিকট প্রাচ্যে আমরা এই ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রকাশ দেখেছি। গরু-গাধাদের কাজে লাগানো, লাঙ্গলের আবিষ্কার, চাকাওয়ালা গাড়ী, পালতোলা নৌকা, পঞ্জিকা এবং লিপির ব্যবহার এ সবই এলো ঐ সময়ে। ধাতুর ব্যবহার, কৃত্রিম সেচ, ইঁট তৈয়ারী, মদ চোলাই এবং অন্যান্য মৌল কারুকর্ম ঐ সময়েই আবিষ্কৃত হ'ল। অনেকে মনে করেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে সভ্যতার পত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহারিক কাজকর্মের সূত্রপাত ঘটেছিল। সভ্যতার প্রথম প্রত্যুষে মানুষ কিন্তু ব্যবহারটাকে, প্রয়োজনটাকে উপেক্ষা করেছিল; তারা চেয়েছিল যা কিছু দর্শনীয়, যা কিছু মহৎ এবং বৃহৎ তাকে রূপ দিতে; অসম্ভবকে তারা সম্ভব করতে চেয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারই আজ পর্যন্ত বহু দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ভিত্তি হ'য়ে রয়েছে। প্রযুক্তি বিদ্যার দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করলে আমরা এ কথা বলতে পারি যে পশ্চিম ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নিয়োলিথিক যুগের প্রভাব অব্যাহত ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউরোপে এই ধরনের মত প্রচলিত ছিল যে ভূমা-জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তা বিধিবহির্ভূত এবং অসংগত ব'লে গণ্য হবে। আমরা একথা শুনেছি যে যন্ত্র-উদ্ভাবক শ্যালোমন দ্য কজ

মহামতি রিশ্‌লুকে জেট বিমানের ইঞ্জিন তৈয়ারীর সম্ভাবনার কথা বোঝাতে গিয়েছিলেন তখন তাকে পাগল ব'লে পাগলা গারদে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকরী যন্ত্রের ব্যবহার করে শিল্পোৎপাদন বাড়াবার কথা যাঁরা বলেছিলেন; তাঁদের কথা প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমরা প্রথম দেখেছি উচ্চতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ব্যবহারিকভাবে কার্যকরী করার চেষ্টা। জঙ্গী ইঞ্জিনীয়র ভোবাঁ এর প্রসংসা করে ফন্টেনেল বলেছিলেন যে তিনি গণিতশাস্ত্রকে দ্যুলোক থেকে নামিয়ে এনে এই পৃথিবীর নানান্ কাজে লাগিয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফরাসী সরকার সর্ব প্রকার যত্নবান হলেন। খামখেয়ালী মানুষদের প্রস্তাবও তারা সাগ্রহে গ্রহণ করছিলেন।

ইউরোপে এই ব্যবহারিক বুদ্ধির অভ্যুত্থান ঘটল খুব ধীরে ধীরে এবং এই অভ্যুদয় এক রাতে ঘটেনি। হঠাৎ লোকে ব্যবহারিক কাজ নিয়ে মেতে উঠল; তারপরেই একেবারে তারা নিষ্কর্মা হয়ে বসে রইল অথবা অন্য কাজের মধ্যে ডুবে গেল। ইউরোপে ধর্মযুদ্ধের অবসানের পরেই হাই মিড্‌ল এজেস বলে যে যুগের সূচনা হল, সেযুগে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-উৎপাদনে জলচক্র (Waterwheel) এবং বায়ুযন্ত্র ব্যবহার খুবই বেড়ে গেল। খনি থেকে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন, ধাতব পদার্থের ব্যবহারও এই সময়ে খুবই বেড়ে গেল; জলাভূমি থেকে জল নিষ্কাশন এবং বনভূমি থেকে বন পরিষ্কার করার ফলে চাষযোগ্য ভূমিরও বিস্তার ঘটল। গ্রেট ব্রিটেনে সংঘটিত এবং ইউরোপে ব্যাপকভাবে প্রসারিত প্লেগ মহামারীর (১৩৪৯) প্রকোপে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল; শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদের বহু অপচয় ঘটেছিল। এর ফলে একটি যুগের শেষ হ'ল; এযুগে আমরা শিল্পবিপ্লবের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছিলাম। পঞ্চদশ শতকে আবার পুনরভুত্থান ঘটল; এর কেন্দ্র ছিল ইতালী ও জার্মানীতে। কাগজ, ছাপাখানার বহুল ব্যবহার, নৌবিদ্যার অভূতপূর্ব অগ্রগতি, সব রকমের বাণিজ্যে এবং কারুশিল্পে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আমদানি, এ সবই দেখা গেল। এযুগ ছিল আবেগ উৎসারিত সৃষ্টি কর্মের যুগ; দূর প্রাচ্য এবং মুসলিম জগতের কাছ থেকে পাওয়া উদ্ভাবন কৌশলটুকু ব্যবহার করেই

এযুগের সৃষ্টিশক্তি নিঃশেষিত হয়নি। নতুন নতুন আবিষ্কারের জন্য অভিযান, সুন্দরের প্রতি অভিসার, উৎকর্ষ, শক্তি এবং আনন্দের সন্ধান করা, ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কার এবং ব্যবহারিক জীবনকে সুন্দরতর করা, এ সবই হল একই প্রেরণার অঙ্গীভূত। পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাসটা ক্রমে শিথিল হয়ে এই জগতেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাটা প্রবল হয়ে উঠল। অনুসন্ধানীরা হারিয়ে যাওয়া স্বর্গরাজ্যের সংগ্রহ সন্ধান করে ফিরতে লাগলেন। পার্থিব স্বর্গরাজ্যের উপাদান হল সৌন্দর্য, উৎকর্ষ, শক্তি এবং আনন্দ। সমাজ সংস্কার করা জীবনকে পূর্ণায়ত রূপ দিতে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন এবং হাতে কলমে কাজের মধ্য দিয়েই তারা এটুকু সম্পন্ন করতে চাইলেন।

ইতালীতে ফরাসীদেশ ও স্পেনের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধল এবং জার্মানীতে যে ধর্মীয় যুদ্ধ ধূমায়িত হয়ে উঠল, তার ফলেই এই অগ্রগতিতে ছেদ পড়ে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবার মানুষের এই ব্যবহারিক বুদ্ধি সুস্থ এবং স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠল। নিওলিথিক যুগের শেষার্ধের কারুশিল্পীরা যে ঐতিহ্য রেখে গিয়েছিল তা আবার সাগ্রহে বুকে তুলে নিল আধুনিক প্রতীচ্য জগৎ।

২

এ সম্বন্ধে কিছুটা সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়ে গেছে যে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিস্তারের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধিটাও ধীরে ধীরে অভ্যুত্থিত হল। দার্শনিক বের্গস বলেছেন যে 'গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি' আবিষ্কারের উন্মাদনাকে উৎসারিত ক'রে দেয়। স্বাধীন ও স্বনির্ভর ব্যক্তির অন্তরেই সুপ্ত রয়েছে সেই সৃষ্টি প্রেরণা যা পৃথিবীর সব কাজেই সার্থক হ'য়ে ওঠে, কার্যসিদ্ধির জন্য উপযুক্ত উপায় এবং সাজ-সরঞ্জাম যথাযথ কাজে লাগিয়ে সে আসল মূল্যটুকু অন্যের কাছে যাচাই ক'রে নেয়। দৃঢ়নিবদ্ধ যূথ-জীবনের ঐক্যে মানুষ তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলে যায়; অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে তারা বর্তমানকে শুধুমাত্র সংযোজকরূপে গণ্য করে এবং দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সুখদুঃখের কথা তারা তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দেয়। সম-

কালান যূথবদ্ধ সামাজিক জীবনে এবং মধ্যযুগীয় যূথবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় আমরা এ সত্যটী প্রত্যয় করেছি। পরন্তু ব্যক্তি মানুষের চোখে বর্তমানের মূল্য সমধিক। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলিই তার জীবনের উপাদান এবং সে যে কাজই করে সে কাজই তার কাছে একটা পরীক্ষার শামিল। সব রকম উপায় গ্রহণ করে সে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে নিতে চায়।

যখনই আমরা মানুষের কর্মশক্তির দ্রুত আবর্তন প্রত্যক্ষ করি, তখনই আমরা ব্যক্তি-মানসের মুক্তির সঙ্গে একে যুক্ত করে দেখি। হয়ত এই মুক্তি ঘটে খুবই অল্প কালের জন্য; দলীয় মত, মন্তব্য এবং সংকেত-পথ থেকে হয়ত ক্ষণিকের জন্য এই ব্যক্তি-মুক্তি ঘটে। এই ধরনের অবস্থায় আমরা মানুষের মধ্যে ব্যবহারিক কাজের প্রতি একটা অনুরাগ লক্ষ্য করি; অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর দায়িত্ব স্বল্পকালের। হয় এই উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে অথবা অন্যবিধ কাজে-কর্মে এর রূপান্তর ঘটে।

নিওলিথিক যুগের শেষে নিকট প্রাচ্যে আমরা যে ব্যবহারিক ক্রিয়া-কর্মের প্রাধান্য দেখেছিলাম, তা ঘটতে পেরেছিল মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্য। মেসোপটেমিয়া এবং মিশরে এক অজ্ঞাত কারণে যে কলহ দ্বন্দের সূত্রপাত হ'ল তার ফলে গ্রামীন সমাজ, গোষ্ঠি এবং জাতির বিনাশ ঘটল, সারা দেশে শুধু ধ্বংসস্তুপ জড়ো হ'য়ে উঠল। যূথভ্রষ্ট মানুষেরা যে সব স্থানে আশ্রয় নিল সেখানে সেখানে গ'ড়ে উঠল নগর, আর এই নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটল। এই ধরণের মিশ্র জনসমাজের কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্য এবং রীতিনীতির বালাই ছিল না, তারা তাদের প্রবৃত্তিকে, তাদের কর্মপ্রেরণাকে রূপ দেবার পূর্ণ স্বাধীনতাটুকু পেয়েছিল। মন্দির, গির্জা এবং রাজবাড়ীকে ঘিরে যে সভ্যতা ধীরে ধীরে মাথা তুলল, তার প্রধান চেষ্টা হল এই মিশ্র জনসমাজকে একটা বৃহৎ খোয়াড়ে জুড়ে দিয়ে তার মধ্যে ঐক্য নিয়ে আসা।

খৃষ্টপুর্ব দু'হাজার বছরের আগে আমরা এই ধরনের পরিস্থিতি লক্ষ করেছি। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে এই সময় গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। মিশরের বদ্বীপ অঞ্চলে ও গ্রীস, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের মতোই বহিরাক্রমণের ফলে লোকে দেশত্যাগ করে চলে যেতে লাগল; এই ধরনের বিপর্যয়ের ফলে গ্রীসদেশের নগর-রাষ্ট্রগুলির, এশিয়া-মাইনরের আয়োনীয়

উপনিবেশগুলির প্যালেষ্টাইনের উপকূলভাগে ফিলিষ্টিন শহরগুলির আবির্ভাব সম্ভব হলো, ইটালীতে গ্রীক ও ইট্রাস্কান উপনিবেশগুলি এবং উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে ফিনিশিয়ান উপনিবেশগুলির পত্তনও সম্ভব .হলো। এই যুগের প্রভাব ব্যবহারিক জীবনে পড়লো, তার ফলে ফোনেটিক অক্ষরমালার আবিষ্কার, লোহা গলানোর পদ্ধতির প্রচার ও মুদ্রার প্রচলন ঘটলো।

এই পরিস্থিতির একটা অদ্ভুত বিকল্প আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ইসলাম সভ্যতার অভ্যুদয়ে ; এটি ঘটলো আরবদের বিজয়ের পরেই। এক্ষেত্রে আমরা ধর্ম্মান্তর করণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মুক্তি প্রত্যক্ষ করলাম, এই ধর্ম্মান্তরটুকু হয়তো আন্তরিক ছিল না, কেবলমাত্র সুবিধার জন্য এটি করা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ হঠাৎ দেখল যে যুগ-প্রবৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং রীতিনীতির নাগপাশ খসে পড়ে গেছে, অথচ নতুন কোন গোঁড়ামি তখনও তাদের বেঁধে দেয় :ন। বিশেষতঃ প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণের অর্থ হোল জীবনের সুযোগ সুবিধার দ্বার খুলে যাওয়া। মুসলিম রেনেসাঁসের অধিকাংশ পুরোধাই আরব দেশ থেকে আসেন নি, তাঁরা ছিলেন হয় পারস্য দেশীয় নয় তুর্কী না হয় ইহুদী, নয়তো গ্রীসদেশীয়, কিংবা স্পেনদেশীয় আর না হয় বারবার। এই নূতন সংস্কৃতির বাহকেরা মূলতঃ মসীজীবী এবং এরা অধার্ম্মিক বলে এমন কুখ্যাত ছিলেন যে গোঁড়া মুসলমানেরা এঁদের সঙ্গে বসে খেতেন না। *

ইসলাম সভ্যতার প্রথম যুগে আমরা দেখেছি যে চারপাশ থেকে আহৃত পুঁথিগত তত্ত্ব এবং পদ্ধতিগুলোকে অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে কাজে লাগানো হয়েছে, দু'তিনশ বছর ধরে এই অগ্রগতি অব্যাহত থেকেছে। স্পেন থেকে মধ্য এশিয়া পর্য্যন্ত সমগ্র মুসলমান জগতে কাগজের কল, চিনির শোধনাগার, কাপড়ের কল, চামড়া, ইস্পাত ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, পালিশকরা ইটের কারখানা এসবই দেখা গেল সীমাতীত সংখ্যায়। জলচক্র এবং বায়ুযন্ত্রের সুসম্বদ্ধ ব্যবহারও এই প্রথম করা হোল। উত্তর আফ্রিকা এবং অন্যান্য অনুর্বর অঞ্চলে বড় বড় কূপ খনন করা হোল এবং সুবৃহৎ সেচ

পরিকল্পনার সূত্রপাত করা হোল। চুম্বক, কম্পাস, ভারতীয় গণিত শাস্ত্র প্রভৃতিকে ব্যবহারিক কাজে লাগানো হোল। সব কারুশিল্পেরই প্রভূত উন্নতি ঘটলো। কিন্তু গোঁড়ামির শিকড় গাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গম জীবন প্রবাহ স্থাবর হয়ে পড়লো, এর পরেই যখন পূর্ব্ব দিকে মোঙ্গলরা আক্রমণ চালালো এবং খ্রীষ্টানেরা স্পেনদেশ জয় করলো তখন ইসলামের অভ্যুত্থানে ছেদ পড়লো।

এই যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগ এটি একদিকে যেমন ধর্মযুগের ফল অন্যদিকে আবার তা ব্যক্তি মানুষের বন্ধন এবং নিষেধ থেকে মুক্তির ফলও বলা যেতে পারে। নিকট প্রাচ্যের সূর্য্য আলোকস্নাত সুসমৃদ্ধ নগর মালা, নাগরিকদের অশনে বসনে লোভনীয় অভিনবত্ব, তাদের দৈনন্দিন জীবনেব উজ্জ্বলতা, ধর্ম্মযুদ্ধের সৈনিকদের অনেকেরই মনে এই সন্দেহ জাগিয়ে দিল যে, পৃথিবীটা পাদ্রীদেব কথামতো শুধুমাত্র অশ্রুসিক্ত নির্ব্বাসনের জায়গা নয়। একটা সুসমৃদ্ধ মুসলিম সভ্যতা কি ভাবে কর্মকে ·আশ্রয় করে বড় হোল তা দেখে এদের মনে এই ধাবণা জন্মাল যে ইউরোপের মানুষদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে। তবুও একথা বলা যায় যে, বোধ হয় মুসলিম জগতের সঙ্গে যোগাযোগই এই পরিবর্তনটুকু ঘটায়নি, কেননা বিজ্যান শিয়াম এবং স্পেনও কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম জগতের সংস্পর্শে এসেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে আমরা এই পরিমাণ আবিষ্কারেব স্পৃহা প্রত্যক্ষ করি নি। যেটি এই প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হোল গতি, সংকীর্ণ জগতের আপন আপন পরিচিত গতিপথ থেকে হাজার হাজার মানুষ বেবিয়ে গেল। স্ববশ ব্যক্তির দেখা আমরা বড় একটা পাইনা সামাজিক উন্নতি এবং পরিণতির জন্য বহুদিন সাধনার পরেও। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি হঠাৎ ঘটে অথবা ঘটে কোন বিপর্যয়ের ফলে। সমষ্টি থেকে ব্যক্তি বিচ্যুত হয়ে পড়ে হয় সে দেশত্যাগ করে না হয় সে পরিত্যক্ত হয় অথবা তাকে জোর করে ধবে নিয়ে যাওয়া হয়। পশ্চিম দেশের অভ্যুত্থানেব সময় বহিরাগত, বহিষ্কৃত এবং শরণার্থী মানুষদের যে কি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা ছিল তা সহজেই অনুমেয়, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আধুনিক প্রতীচ্যের অভ্যুদয়ের মূলে রিফরমেশন আন্দোলন রয়েছে তা কিন্তু আপন মতবাদ বা ভাবাদর্শের দ্বারা এই অভ্যুত্থানকে সম্ভব করে নি, ধর্মীয় শাস্তি এবং অত্যাচারের ফলে পশ্চিম ইউরোপে শরণার্থী মানুষেরা এবং

দেশত্যাগীরা দলে দলে চলে গেল। ষোড়শ শতাব্দীতে নেদারল্যাণ্ডের দেশগুলির অভূতপূর্ব আর্থনীতিক উন্নতি ঘটলো স্পেন, পর্তুগাল এবং ফরাসী দেশ থেকে আগত মানুষদের জন্য। অনুরূপভাবে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স এবং নেদারল্যাণ্ড থেকে আগত প্রোটেস্ট্যাণ্ট এবং ক্যাথলিক নাগরিকের দল ইংল্যাণ্ডের অভাবিত শিল্পশক্তির গোড়া পত্তন করলো। পূর্ব গোলার্ধ থেকে আগত মানুষেরা যখন আমেরিকায় বসবাস আরম্ভ করলো এবং আমেরিকার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরন্তর ছোটাছুটি করতে লাগলো তখন আমরা তাদের শক্তির যে স্ফূরণ দেখেছি তা হলো এই প্রসঙ্গে মনে রাখবার মতো একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ।

৩

এখন প্রশ্ন হোল প্রাচীন গ্রীসদেশে কেন আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাদের বুদ্ধি এবং উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ দেখলাম না যদিও সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি এবং ইহকালের প্রতি মানুষের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। আমাদের সভ্যতার মতোই গ্রীক সভ্যতা ব্যবহারিক কাজকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেনি; অবশ্য গ্রীক সভ্যতার বিস্ময়কর অনন্যসাধারণতা ছিল। এঁরা বিশ্বাস করতেন যে স্বাধীন মানুষ খুব কাজের লোক হয়ে উঠলে তাদের দেহ, বুদ্ধি এবং আত্মা কালক্রমে ভালো কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

কি পরিমাণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়েছে তার উপর ব্যবহারিক বুদ্ধির অভ্যুদয় বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল; এই উত্তরটাই প্রথমে আমাদের মনে পড়ে। যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একেবারেই অন্যের সঙ্গে যুক্ত নয় সেক্ষেত্রে নেতৃত্ব করে অথবা আপনার সুপ্ত শক্তির যথাযথ বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তি-মানুষ আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করে; কাজের মধ্য দিয়ে সে তা করে না।

গ্রীসদেশে এটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এথেন্স নগরীতে যে ত্রিশ হাজার স্বাধীন মানুষ বাস করতেন তাঁরা তাঁদের শক্তির এতটুকুও ব্যয় করতেন না দৈনন্দিন জীবিকানির্বাহের জন্য; দু লক্ষ ক্রীতদাস তাঁদের কাজ করে দিত, উপরন্তু প্রতীচ্যে ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে কাজের একটা আত্যন্তিক যোগ ছিল;

তাই সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল; প্রত্যেকটি মানুষ সেখানে কার্য্যসিদ্ধির জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত।

তবুও সব কথা বলা হোল না। গ্রীসদেশে ব্যবহারিক কাজকর্মকে যে অবহেলা করা হত তার কারণ তাদের সমাজে বুদ্ধিজীবীরাই প্রধান ছিল। বুদ্ধিবাদীদের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি যে একটা বহুদিনের বিরোধিতা ছিল সে সম্বন্ধে অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। ইতিহাসের অতি প্রত্যুষে প্রায় বর্ণলিপির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিরোধ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো। নিকট প্রাচ্যে বর্ণলিপির উদ্ভাবন হোল ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে; খাজাঞ্চি-খানায় এবং গুদামঘরে হিসেব রাখার সুবিধার জন্যই এর আবিষ্কার। অঙ্ক-ষষ্টি এবং ফর্দে আমরা প্রথম দৃষ্টান্ত পাই। রাজবাড়ীতে এবং মন্দিরে এই লিপিকলার প্রচলন ঘটে; যাঁরা লিপিকুশল ছিলেন তাঁরা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। তাঁতী, ছুতোর এবং কুমোরের মত এই লিপিকারের কাজ কিন্তু অবিসংবাদিত উপযোগিতার দাবি রাখতো। অধিকন্তু প্রথম থেকেই এই লিপিকারকে পরিচালকমণ্ডলীর একজন বলে মনে করা হোত; শ্রমিক শ্রেণীর একজন বলে তাকে গ্রাহ্য করা হোত না। এর ফলে লিপিকার এক বিশেষ মর্যাদা পেত; তার মনোবৃত্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গি তার সমাজের উপরে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতো; যেহেতু সমাজে তার উপযোগিতা নিঃসন্দিগ্ধভাবে স্বীকৃত হোত না তাই সে ব্যবহারিক উপযোগিতাকে মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করলো না। অপর থেকে দূরে সরে থাকার প্রবণতা ব্যবহারিক জীবনের প্রতি তাকে বিমুখ করে তুললো, যেহেতু ব্যবহারিক কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষের মতোই সাধারণ মানুষেরাও আপনার উৎকর্ষ প্রদর্শন করতে পারতো। তাই এই লিপিকার বা লেখক গোষ্ঠী মানুষের কৃতিত্ব দেখাবার ক্ষেত্রটি এমনভাবে সংকীর্ণ করে দিল যেখানে জনগণের প্রবেশের অনুমতি রইলো না।

সর্বোপরি এ কথা বোধ হয় সত্য যে যে ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী এবং তাঁদের সমগোত্রীয়েরা সমাজে প্রাধান্য লাভ করেছেন সে-ক্ষেত্রেই ব্যবহারগত প্রয়োগে তাঁদের প্রতিভা প্রযুক্ত হয়নি। এই ধরনের সমাজব্যবস্থায় মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি প্রায়শঃই কল্পনাপ্রবণ, অত্যদ্ভুত পথে হালকা খেলাধূলার মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করে। এই হিরোরা বাষ্পযান মন্দিরে ভেল্‌কি দেখাতো এবং ভোজ-

সভায় অভ্যাগতদের আনন্দ দিত। প্লুটার্ক বলেছিলেন, আর্কিমিডিস ইঞ্জিনীয়ারদের কাজকে তুচ্ছ এবং ইতরজন সুলভ মনে করতেন এবং তাঁদের যন্ত্রপাতিগত আবিষ্কারকে খেলার সামগ্রীরূপে গণ্য করতেন। যে চীন দেশে মান্দারিনের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে চুম্বকচালিত কম্পাস, গোলাবারুদ এবং ছাপাখানা দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করেনি। কবরখানাগুলোকে ঢেলে সাজাবার জন্য কম্পাস ব্যবহৃত হোত, ভূত তাড়নের জন্য গোলাবারুদের ব্যবহার করা হোত এবং কবচ, তাগা এবং কাগজের টাকা ছাপার জন্য ছাপাখানা ব্যবহার করা হোত। ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীদের গণিতশাস্ত্রে অদ্ভুত পারদর্শিতা ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে কোথাও প্রভাব বিস্তার করেনি; দৈনন্দিন জীবনের ভার লাঘব করার জন্য বৌদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি এতটুকুও প্রয়োগ করেন নি। তাঁরা জলচক্র দিয়ে খাদ্যশস্যকে আহারের উপযুক্ত করার চেয়ে তার দ্বারা প্রার্থনা বলতে লাগলেন। প্রতীচ্যেও শিক্ষিত করণিকের দল মধ্য যুগে এবং রেনেসাঁস যুগের প্রথম দিকের মানবতাবাদীরা বৈপ্লবিক আবিষ্ক্রিয়াগুলি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার বিরোধী ছিলেন। মানবতাবাদীরা ছাপাখানা আবিষ্কারের বিরোধী ছিলেন এবং ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলিকে তাঁরা গ্রাহ্য করেননি।

এটা খুব মজার কথা যে যদিও বুদ্ধিজীবীরা নিজেরা কাজের জগতে আকণ্ঠ ডুবে থাকেন তবুও, তাঁরা ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁদের তাচ্ছিল্য প্রকাশে দ্বিধা করেন না। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে বুদ্ধিজীবীরা প্রধান এবং তাঁরা গোটা দেশটার শিল্পের উন্নতি ঘটাতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু যদিও তাঁরা সারা দেশে কল-কারখানা স্থাপন, খনির সন্ধান, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনে আগ্রহশীল তথাপি তাঁরা এই সব প্রকল্পের ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে এতটুকু আগ্রহশীল নন। তাঁদের আগ্রহ হোল বৃহৎ মনোমুগ্ধকর অসাধারণ এবং আশ্চর্যজনক কিছু করা। শুধুমাত্র কাজের কথায় প্রয়োজনের ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ নেই, তাই তাঁরা খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ এবং দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য উপকরণ সম্পর্কে প্রায় সেই আদিম বর্বর অবস্থাকে আঁকড়ে ধরে আছেন। হ্যারিসন ই. স্যালিসবারি * তাঁর সাম্প্রতিক সোভিয়েট রাশিয়া সফরের সময়

খুব আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে, সে দেশের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের কোন সম্পর্ক নেই; অথচ আমেরিকাতে এই দুটির সম্পর্ক পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত। কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধেও একথা সত্যি। তিনি একটিমাত্র সুবৃহৎ কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র দেখেছিলেন যেমনটি প্রায়শঃই আমেরিকাতে দেখা যায়; এবং এটিও তিনি দেখেছিলেন রুমানিয়াতে। সেখানে অধ্যাপকরা আত্মসচেতন হয়ে কাজ করেন এবং তাঁরা স্যালিসবারিকে বলেছিলেন যে লোকেরা তাঁদের আমেরিকান বলে।

আমেরিকায় ব্যবহারিক জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, কারণ ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটা সভ্যতার দেখা পাওয়া গেল যে সভ্যতায় আর্থনীতিক ব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা সবকিছুই পরিচালিত হয় বুদ্ধিজীবী-দের সাহায্য ব্যতিরেকেই। সম্ভবতঃ দেশের সামরিক রক্ষাব্যবস্থা এবং অগ্রগতি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এবং পুঁথিগত বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাকর্ম ব্যবহারিক প্রয়োজনকে ক্ষুন্ন করায় আজকের দিনে ব্যবহারিক প্রয়োজনের মর্যাদা কমে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে যে প্রশংসা আমরা শুনি তার মূলে বোধ হয় আছে ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রচ্ছন্ন নিন্দা। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই এক্ষেত্রেও আমাদের জগৎ তার সংক্রমণ পূর্ণ করছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে সামরিক স্থপতি vaubanকে প্রশংসা করা হয়েছিল গণিত শাস্ত্রকে দ্যুলোক থেকে ভূলোকে নামিয়ে আনার জন্য এবং তাকে কাজে লাগানোর জন্য। এখন মনুষ্যনির্মিত গ্রহকে আমরা যখন মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ করে দিচ্ছি তখন একথা বলা যায় আমাদের বুদ্ধি এবং উদ্ভাবনী শক্তিকে ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে উঠিয়ে নিয়ে মহা-শূন্যাভিমুখী করে দিচ্ছি।

৪

বুদ্ধিজীবীর ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রতি বিরূপতা লিপিকলার ক্রমোন্নতিতে অতি প্রত্যক্ষ। একথা আমরা আগেই বলেছি যে লিপিকলার উদ্ভাবন করা হয়েছিল মালপত্তরের হিসেব নিকেশ নির্ধারণ করার জন্য, বিদ্যাপীঠস্থানে

বর্ণলিপির আবিষ্কার হয় নি ; এর আবিষ্কার হয়েছিল মালপত্তরের গুদামঘরে। ব্যবসায়ী মানুষ সবপ্রথমে বর্ণমালার চিন্তা করেছিলেন ও বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন চিরকুট এবং মালিকানার অন্যান্য সংকেত মানুষে ব্যবহার করতো মৃন্ময়ফলক এবং ফরাসীদেশে ব্যবহৃত পেপাইরস ব্যবহারেরও আগে। কিন্তু একবার যখন লেখক লিপিকলাটুকু আয়ত্ত করলেন তখন থেকে তিনি আর এটির সরলীকরণ অথবা উন্নতি বিধানের চেষ্টা করলেন না। লিপিকলা আবিষ্কারের দুহাজার বছরেরও পরে এর জটিলতা এবং দুরূহতার কিছুমাত্র কমতি হোল না ; সারাজীবনের সাধনার ফলেও একে আয়ত্ত করা দুরূহ হয়ে রইল। বাস্তবিকই মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং চীনের মতো দেশে যেখানে লেখক গোষ্ঠীর অপ্রতিহত প্রভাব ছিল সেখানে লিপিকলার গতি বিপরীতমুখী হয়েছে। লিখনশিল্পকে নানাধরনের স্বরবিকারমণ্ডিত করে তোলা হয়েছে। সংক্ষেপে লেখকগোষ্ঠী চাইলেন লিখনশিল্পকে তাঁদের কুক্ষিগত করতে ; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার বিস্তৃত প্রয়োগ এবং প্রসার তাঁরা চাইলেন না। এই জটিলতা এবং দুরূহতার মধ্যেই লিপিকার চাইলেন আপনার স্বার্থকে কায়েম করতে। ভাষার ধ্বনি বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণমালার প্রবর্তন করে লিখনশিল্পের সরলীকরণ বাইরের লোকেরা এসে করলেন, এই বাইরের লোকেরা হলেন ফিনেশীয় ব্যবসায়ী সমাজ।

একথা প্রায়ই বলা হয় যে মেসোপোটেমিয়া এবং মিশর দেশের আর্থনীতিক অবস্থাই লিপিশিল্পের উদ্ভাবনের জন্য মূলতঃ দায়ী ; মন্দিরে পুজো দেওয়া এবং এক বিরাট সেচ প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করা এর মূলে ছিল। প্রকৃতপক্ষে আর্থনীতিক পরিস্থিতি এর পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না। ইন্‌কা সাম্রাজ্যে কোন বর্ণমালার প্রচলন ছিল না যদিও এদের আর্থনীতিক অবস্থা মিশর দেশের এবং মেসোপটেমিয়ার অনুরূপ ছিল। যে সমাজের মানুষের অবস্থা হোল প্রাক্ শিক্ষিতের অবস্থা সেখানে আমলাতান্ত্রিক শাসন যন্ত্র বেশ স্বচ্ছন্দে কাজ করে ; কিন্তু সেখানে লিপির প্রচলন ঘটে না। লেখকগোষ্ঠীর সভ্যেরা পুরোপুরি এই গোষ্ঠীভুক্ত হবার পূর্বেও লিপিকলার সরলীকরণ অথবা তার ব্যবহারিক প্রয়োগ চান না। লিপিকলাকে জটিল এবং দুরূহ করে রাখার মধ্যে তারও কায়েমী স্বার্থ আছে। লিপিকলার।

উদ্ভাবনের মূলে ছিল স্বাধীন ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টা। একথা আমরা জানি যে স্থানীয় বাজারে প্রচলিত বিনিময় পদ্ধতি ছাড়া "ইন্‌কাদের" কোন ব্যবসায়-বিধি জানা ছিল না কেননা খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আদান-প্রদান বণ্টনাদি সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোত। এই একই সংকেত অনুসরণ করে একথা আমরা বলতে পারি যে নিওলিথিক যুগের শেষে মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের ব-দ্বীপ অঞ্চলে এই স্বাধীন ব্যবসায়ীদের বসবাস ছিল।

ইনকা সাম্রাজ্যের মতোই মসিজীবী প্রভাবিত মিশর দেশে এই স্বাধীন ব্যবসায়ীদের দেখা পাওয়া যেত না। খ্রীষ্টপুর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের আগে আমরা ব্যবসায়ী কথাটির দেখা পাই নি; অবশ্য মন্দিরের যে আধিকারিককে বিদেশে ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া হোত তাকে ব্যবসায়ী বলা হোত। মেসোপটেমিয়ায় বাণিজ্য পথগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তে ছিল এবং রাষ্ট্র ব্যবসা-বাণিজ্যকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছিল। ধনী এবং সুসমৃদ্ধ মেসোপটেমিয়ার ব্যবসায়ী সমাজ নিজেদের স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র মনে করতে পারে নি তাই তারা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারে নি। চীন মহাদেশে চৌ-রাজবংশের রাজত্বকালের শেষের দিকে স্বাধীন ব্যবসায়ীরা আত্ম কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছিল; এই সময়েই ব্যুরোক্র্যাটিক বা আমলাতান্ত্রিক শাসন যন্ত্র অচল হয়ে পড়ে। আমরা লিপিকলার উদ্ভাবন সম্বন্ধে যেটুকু জানি তার থেকেও কম জানি ব্যবসায়ী সমাজের আদি ইতিবৃত্তের কথা। আমরা এযুগের কমিউনিস্ট দেশগুলিতে যা ঘটছে তা লক্ষ করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে ব্যবসা বাণিজ্য হোল সাধারণ মানুষের উপযোগী আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস; কমিউনিস্টদের সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে তত্ত্ব বিরোধী, অসংলগ্ন, ভীরুজনোচিত, সমন্বয়বিরোধী কার্য্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন সার্বভৌম শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন সম্ভব হয়নি এই ব্যবসায়ীদের দ্বারা; একথা অনেকে বলেছেন। কিন্তু এই সার্বভৌম শাসন-ব্যবস্থার কোথাও ফাটল দেখা দিলে ব্যবসাদারেরা সেই ফাটলে অনুপ্রবেশ করে তাকে প্রশস্ত-তর করে দিয়েছিল। তাই তার তুচ্ছ উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াস এবং কর্মপন্থার অসমীচীনতা সত্ত্বেও ব্যক্তি স্বাধীনতার অভ্যুদয়ের ব্যাপারে তার স্থান খুব উচ্চে। এই প্রসঙ্গে আমাদের যা বিবেচ্য তা হোল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও কর্মশক্তির প্রয়োগ।

একথা সত্যি যে, যে-ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী নিজেকে সর্বপ্রধান মনে করে সে-ক্ষেত্রে অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর মতোই একেবারে নির্মম হয়ে উঠতে পারে। প্রাচীন জগতের পতনের মূলে ছিল ক্রীতদাসত্ব প্রথা; রাজা পুরোহিত এবং লেখকগোষ্ঠীর মতোই ব্যবসায়ীরাও এই ক্রীতদাসত্ব প্রথার পোষকতা করেছিল। একথাও সত্যি যে অতীতে বহুদিন ধরে ব্যবসা বাণিজ্য কতকগুলি গতানুগতিক পথে চলছিল, কিন্তু একথাও বলতে হয় যে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমেই জিনিষপত্রের আদান প্রদান এবং পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল; এরই ফলে জবরদস্ত সরকারের প্রতিষ্ঠার চেয়েও জনহিতৈষী জনগণের মতানুসারী সরকার পত্তনের সুবিধা হয়েছিল। ব্যবসায়ীর সেই বাক্‌পটুতা এবং বচনের তীব্রতা ছিলনা যদ্দারা সে তার আপন অভাব অভিযোগকে এক পরম সত্যের মূল্য দিয়ে পৃথিবীর উপর চাপিয়ে দিতে পারতো। বুদ্ধিজীবী লেখকদের সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কোন কর্তৃত্ব দেওয়া হয় না। ব্যবসায়ী প্রভাবিত সমাজে, সাংস্কৃতিক ব্যাপারে অবশ্য তাকে মেনে চলা হয়। এই লেখক বা করণিকের কর্তৃত্ব প্রয়াসকে বিফল করে দেওয়ার ফলেই ব্যবসায়ীদের উপর এঁরা চটে যায় এবং ব্যবসায়ীদের উপর এঁরা ঠাট্টা বিদ্রূপও করে। কিন্তু এইভাবে তাঁরা লেখকদের সৃষ্টিশক্তিকে উৎসারিত করে তোলে। তাই এটা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয় যে, যখন সমাজে ব্যবসায়ীদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত সেই সময়ে ভাববাদী, আয়োনীয় দার্শনিকদল, কনফুসিয়স এবং বুদ্ধদেবপ্রমুখ মহাপুরুষদের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য এ কথা রেনেসাঁস অভ্যুদয়ের সম্পর্কেও সত্য; বিজ্ঞান সাহিত্য এবং শিল্পকলা সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

যে সমাজে লেখকগোষ্ঠীর আধিপত্য সেখানে ব্যবসায়ীদের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বিধি এবং তাদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যে তারা পাদ প্রদীপের সামনে আসতে পারে না। যখন এই লেখকগোষ্ঠী ক্ষমতাসীন হন তখন কাজের লোকের হাত থেকে তাদের কাজটুকু কেড়ে নিয়ে তাঁরা গভীর তৃপ্তি লাভ করেন এবং তাদের এমন সব কাজ করতে বলা হয় যে কাজ করা প্রায় অসম্ভব; এই সব অসাধ্য কাজ সম্পন্ন করতে গিয়েই এদের অনেকে বিনষ্ট হয়। ব্যবসায়ী প্রভাবিত সমাজে যখন এই লেখকদের সহ্য করা হয় তখন তার অর্থ হোল সক্রিয় একটি বিরোধী দলকে বাঁচিয়ে রাখা যাদের কণ্ঠে তাদের

অভাব অভিযোগ এবং ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ এবং বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়ে উঠবে। তাই এই সেদিন পর্য্যন্ত ব্যবসায়ী এবং লেখকদের বিরোধে সবচেয়ে যে ভালো ফল ফলেছে তা হোল একে অপরের একচেটিয়া অধিকারকে তারা ক্ষুণ্ণ করেছে। লেখকের শিক্ষাগত একচেটিয়া অধিকার ব্যবসায়ীরা খর্ব করে দিয়েছে সরলীকৃত বর্ণমালা, ছাপাখানা এবং লোকশিক্ষার প্রবর্তন করে। পক্ষান্তরে ব্যবসায়ীকে তার ঐশ্বর্য থেকে পৃথক করে দেখার মত যে আন্দোলন হয়েছে তার পু'রাভাগে ছিল লেখকগোষ্ঠী। এই বিবাদের ফলে জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য বৃহত্তর জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জিহোভা ও কলের যুগ

একবার আমি একজন খুব বুদ্ধিমান তরুণ রাষ্ট্রবিদ্যার অধ্যাপককে বলতে শুনেছিলাম যে যদি গ্যাসের মতো জনমতও তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তো এবং যদি গ্যাস যে বিধিতে ছড়িয়ে পড়ে সেই একই নিয়মে জনমতও ছড়িয়ে পড়তো তাহলে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াতো। অবশ্য তাঁর কাছে এই ভাবটি খুবই কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়েছিল, তবুও তিনি এই নিয়ে আলোচনা করতে উৎসুক ছিলেন।

আমি যখন তাঁর কথা শুনছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল গ্যালিলিও অথবা কেপলারের কাছে হয়তো এই ভাবটি অদ্ভুত বলে মনে হোত না; তার কারণ কেপলার এবং গ্যালিলিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ভগবান, এই বিশ্বসৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন: এবং এই ভগবান হলেন গণিতশাস্ত্র পারংগম এবং কারুকলা বিশারদ। গণিতশাস্ত্রে ভগবানের কর্মরীতিটুকু ছাড়া আর কিছুই নয়; গ্রহ নক্ষত্রের গতি, পাখীর উড়ে যাওয়া, গ্যাসের ছড়িয়ে পড়া অথবা মতের প্রচার করা এ-সবের মধ্যেই ভগবানের গাণিতিক শক্তির স্বাক্ষর বর্ত্তমান।

আধুনিক মানুষের কানে এটা অদ্ভুত শোনায় যে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা যে সকল ব্যক্তি তাঁদের উদ্বুদ্ধ এবং পরিচালিত করেছে ভগবান সম্বন্ধে এক বিশেষ প্রত্যয়। যে কোন আবিষ্কারই করুন না কেন তাঁরা ভেবেছেন যে তাঁরা ভগবানের সান্নিধ্যে রয়েছেন। প্রকৃতির গাণিতিক নিয়মগুলির আবিষ্কারের প্রয়াসকে তাঁরা ধর্মীয় সন্ধানের সমগোত্রীয় ভেবেছেন; ভগবানের পুঁথি হোল প্রকৃতি এবং ভগবানের বর্ণমালা হোল গাণিতিক সংকেতগুলি।

গ্যালিলিও আমাদের বলেছেন যে প্রকৃতি তার গ্রন্থ লিখেছে আমাদের ভাষায় নয়; তার নিজস্ব বর্ণমালা আছে, তারা হোল ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বলয়, ত্রিকোণ এবং পিরামিড প্রভৃতি অন্যান্য গাণিতিক রূপ। এ-সম্বন্ধে

কেপলার এতখানি স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন যে মহাশূন্যের গ্রহ উপগ্রহের গতির নিয়ন্ত্রক বিধিগুলির আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি ভগবানের গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করছেন। পরে তিনি গল্প করে বলেছিলেন যে সৃষ্টিকর্তা ভগবানকে তাঁর দুর্বোধ্য গ্রন্থের প্রথম পাঠকের দেখা পেতে ছয় হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। লিওনার্দো দ ভিঞ্চি যখন শবব্যবচ্ছেদ করছিলেন তখন তারই ফাঁকে দু'ছত্র প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন 'হয়তো সৃষ্টিকর্তা এই ভেবে খুশী হবেন যে আমি মানুষের প্রকৃতি এবং তার রীতি-প্রবৃত্তি উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছি যেমন আমি তার ছবিও আঁকতে পারি।' মানুষের শারীরস্থান (Anatomy) সম্বন্ধে জানার জন্য লিওনার্দোর যে আগ্রহ তা তাঁর শিল্পী সত্তা থেকে উদ্ভূত, অবশ্য বৈজ্ঞানিক এবং কারুকলাকার হিসাবে তার জন্য যে অনুসন্ধিৎসা তাও এর পিছনে ছিল। ওস্তাদ কারিগরের দ্বারা নির্মিত আশ্চর্যজনক যন্ত্র হোল এই প্রাণবন্ত জীবের দল এবং লিওনার্দোর অন্বীক্ষা হোল এই জীবদেহের গঠনতন্ত্র কেমন এবং তারা কি ভাবে কাজ করে। এই জীবদেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ এবং এদের নিয়ে খেলা করতে করতে মানুষ ওস্তাদ কারিগর হয়ে উঠতে পারে। পরিশেষে হয়তো এমন যন্ত্র তারা আবিষ্কার করবে যে যন্ত্র দেখতে পায়, শুনতে পায়, আকাশে উড়ে যেতে পারে। যন্ত্র তৈরি করা দ্বিতীয় সৃষ্টি কর্মের তুল্য; জড়পদার্থে ইচ্ছা এবং চিন্তা অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়াই হোল মানুষের এই দ্বিতীয় সৃষ্টি কর্মের লক্ষণ।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে আমরা যে পার্থক্যটুকু লক্ষ করি তার মূলে রয়েছে ভগবানকে সেরা গাণিতিক এবং কারুকার হিসাবে বিবেচনা করা। শিক্ষার পুনরুজ্জীবন প্রাচীন ধ্যান ধারণা এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল কিন্তু বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন গ্রীক বিজ্ঞান চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও গোড়া থেকে এক সার্বভৌম স্ব-নির্ভর চরিত্রের ইঙ্গিত দিয়েছিল। ভগবানের দুর্বোধ্য লিপি এবং সংকেত সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতা বিজ্ঞানীদের প্রাচীন পুঁথি এবং প্রথাকে অনুসরণ থেকে বিরত করেছিল। এক্ষেত্রে ভগবান সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা বিজ্ঞানীদের বুদ্ধিগত স্ববশ্যতাটুকু রক্ষা করেছিল।

অবশ্য একথা বলা চলেনি আধুনিক বিজ্ঞান এবং কারিগরী-বিদ্যা ভগবান

সম্বন্ধে কোন ধারণা ছাড়াই উন্নতি করেছিল, কিন্তু তবুও এতদুভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ রয়েছে তার নিহিতার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। এঃ ন কথা বলা যেতে পারে যে প্রতীচ্যের মানুষকে হয়তো এমন একটি ভগবানের কল্পনা করতে হয়েছে যে ভগবান একাধারে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদ। এবং বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা প্রভাবিত সভ্যতা সৃষ্টি করতে হলে তাঁকে এটুকু হতেই হবে। একথা বোধ হয় পুরোপুরি সত্য নয় যদিও একথা অনেকে বলেন যে মানুষ তার নিজের মতো করে ভগবানকে সৃষ্টি করে। উপরন্তু মানুষ ভগবানকে সৃষ্টি করে নিজের অভিলাষ এবং স্বপ্নকে অনুসরণ করে, সে নিজে যা হতে চায় তারই অনুকরণে তার ভগবানের সৃষ্টি। একটি বিশেষ সমাজ যে পন্থায় তার অভিলাষ পরিপুর্ণ করে সেই পথেরই অঙ্গ হোল ভগবৎ সৃষ্টি; একটি বিশেষ দেবতাকে কেন্দ্র করে তারা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করে এবং তারপরেই সেই দেবতাকে অনুসরণ করে। এই অভুতপূর্বকে সত্য করে তোলার জন্য যে আত্মপ্রত্যয়ের দরকার সে আত্মপ্রত্যয়টুকু মানুষের কল্পনা থেকে জন্ম নেয়; সে কল্পনা হোল আমরা যখন নূতনকে লাভ করি তখন আমরা তাকে সৃষ্টি করি না, আমরা শুধুমাত্র অনুকরণ করি। আমাদের স্বর্গলাভের প্রয়াসটুকু একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টার অঙ্গ মাত্র, সে প্রচেষ্টাটুকু হোল অভূতপূর্বের জন্য পূর্ব দৃষ্টান্তের অনুসন্ধান করা।

মানুষের জ্ঞান সীমায়িত, তারই পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা চলে যে অন্যান্য সভ্যতার যথেষ্ট উদ্ভাবনী শক্তি এবং সৃষ্টিশীলতা থাকা সত্ত্বেও তারা যন্ত্রযুগের পত্তন করতে পারে নি, কেননা তারা তাদের ভগবানকে, দেবতাকে একজন সর্বশক্তিমান ইঞ্জিনীয়ার বলে ভাবতে পারে নি। কেননা সর্বশক্তিমান জিহোভা সৃষ্টির আদি থেকে এমন সব কাজ করেছেন বলে আমরা জানি যা আধুনিক যন্ত্রযুগেও করা সম্ভব হয়না। তিনি দরজা দিয়ে সমুদ্রের জল বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন,—"এই পর্যন্ত তুমি আসবে কিন্তু এর বাইরে আসবে না; এই পর্য্যন্ত এসে তোমার গর্বোন্মাদ ঢেউরা থেমে যাবে।" তিনি মরুভূমির বিজনতায় ছোট ছোট জলাশয় সৃষ্টি করলেন এবং মরুভূমিকে মরূদ্যানে পরিণত করলেন। তিনি সংখ্যা দিয়ে গ্রহ নক্ষত্রকে চিহ্নিত করে দিলেন, তাদের নাম ধরে ডাকলেন। তিনি মেঘেদের হুকুমনামা জারি করলেন এবং নদীদের বললেন কোন দিকে বয়ে যেতে হবে। তিনি তাঁর

করপুটে জলরাশির পরিমাপ করে দিলেন এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্য পরিক্রমা করলেন। তিনি অনন্ত ধূলিরাশির পরিমান নির্দ্ধারণ করলেন এবং পাহাড়গুলোকে দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে ওজন করে দিলেন।

মধ্যযুগের শেষে ইউরোপ ভূখণ্ডে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখি তা হোল যীশুখ্রীষ্টকে অনুকরণ না করে ভগবানকে অনুকরণ করার প্রবণতা। নূতন বিজ্ঞানীর দল যে ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন এবং পৃথিবীর গতিকে অব্যাহত করেছিলেন তার সঙ্গে একটি নিগূঢ় যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। ভগবান সম্বন্ধে তাঁদের ভীতির অন্ত ছিল না তবু তাঁব সঙ্গে সামীপ্যবোধটুকুরও অভাব ছিল না। ভগবানের মনের চিন্তাই তাদের চিন্তা এবং জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে তাঁরা ভগবানের মতোই হতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমী সভ্যতার আজন্ম জঙ্গমতাটুকু ভগবানকে অনুকরণ করার ফলস্বরূপ এবং এটাই অন্যান্য সভ্যতা থেকে পশ্চিমী সভ্যতার বিভেদক। শুধুমাত্র এই নূতন বিজ্ঞানীরাই বা কেন সব শিল্পী, আবিষ্কারক, শিল্পপতি এবং কাজের মানুষেরা এ কথাই ভেবেছিলেন যে মানুষ যা ইচ্ছা করে তাই করতে পারে। অ্যালবার্টি এই কথাই বলেছিলেন। আবিষ্কারকালে কলাম্বাসের উচ্ছ্বাস 'Il mondo e poco' নৈরাশ্যকে প্রকাশ করে নি; মানুষের জয়কেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি। মানুষ যে সব উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেছে, যে সব উন্নত কীর্তিস্তম্ভ রচনা করেছে তা ভগবানের গৌরবকে ম্লান করে দিচ্ছে, কারণ অনুকরণের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব আছে; যাকে অনুকরণ করি তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাটুকু সেক্ষেত্রে বর্তমান। জড়-জগতের উপরে ক্রমবর্দ্ধমান প্রভুত্ব প্রতীচ্যের মানুষের মনে এই ধারণা জন্মিয়েছিল যে তারা ভগবানকে প্রায় ধরে ফেলেছে। তাদের এ ধারণা হোল যে, ভগবানের সৃষ্টিকে তারা বশ করে ফেলেছে এবং মানুষের সৃষ্টি ভগবানের সৃষ্টির চেয়েও মহত্তর। পশ্চিম দেশের মানুষেরা সর্বপ্লাবী সেই মনুষ্যলহরীর কলতান শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল এবং আশা করতে থাকল যে, এরা স্বর্গরাজ্য প্লাবিত করে দেবে। তারা যা কিছু করবে ভেবেছে তা থেকে তাদের কেউই বিরত করতে পারবে না।

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রমজীবী ও কর্তৃপক্ষ

আমাদের মধ্যে অনেকেই আজীবন শ্রমজীবীর ভূমিকায় কাজ করছি ; আমরা জানি বা না জানি আমরণ আমাদের এই ধরনের শ্রমজীবী থাকতে হবে। স্বর্গে ভগবান থাকুন বা নাই থাকুন, আমরা স্ববশ থাকি বা না থাকি, আমাদের উপজীবিকার মান উচুই হোক বা নীচুই হোক, আমি এবং আমার মতো লোকেরা যা করছি তাই করতে থাকবো। এই সত্যের উপলব্ধি অবশ্য খুব বেশী নৈরাশ্যের কারণ হয়ে উঠবে না যদি আমাদের কাজ করার অভ্যেস থাকে এবং আমেরিকার শ্রমজীবীর মতো যদি তাদের নাগালের মধ্যে জীবনকে উপভোগ করবার সুযোগ সুবিধা থাকে। তবুও একথা বলবো যে সারা জীবন শ্রমজীবী হয়ে থাকার সম্ভাবনা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে ; এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শ্রমজীবীর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধটা কেমন দাঁড়ায় সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়তো প্রাসঙ্গিক হবে।

আজন্ম শ্রমজীবীর কাছে কর্তৃপক্ষের চেহারাটা একই রকমের যদি বা সে কর্তৃপক্ষ মুনাফালোভী হয় অথবা আদর্শবাদী হয় কিংবা কারুবিদ অথবা আমলাতন্ত্র হয়। কর্তৃপক্ষ তাঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন এবং ফল সম্বন্ধে আগ্রহশীল ; তার উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন সে শ্রমজীবীকেও তার উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র ছাড়া অন্য কোনরূপ দেখতে প্রস্তুত নয়। তাদের বেশী করে খাটিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য লক্ষ্য তার নেই ; তা সে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যই হোক বা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হোক অথবা শুধুমাত্র কর্মতৎপরতা দেখানোর জন্যই হোক।

কর্তৃপক্ষকে শত্রুরূপে ভাবার প্রয়োজন হয় না অথবা সারাদিনের কাজ করে আত্মপ্রসাদ লাভেরও প্রয়োজন হয় না যখন আমরা একথা ভাবি যে কর্তৃপক্ষ যদি শ্রমজীবীর সহযোগিতাটুকু পাবেন বলে ধরে রাখেন তা হলে কর্মস্রোতে ভাঁটা পড়তে পারে ; শ্রমিকেরা কি বলবে না বলবে তাকে

আমল না দিয়ে যখন কর্তৃপক্ষ তাঁদের কর্মপন্থা স্থির করেন তখনও এটা হতে পারে।

এ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল এই যে শ্রমিকের সহযোগিতাটুকু সহজলভ্য বলে ভাবা হয় যখন কর্তৃপক্ষের জোর করে কাজ করিয়ে নেওয়ার সীমাহীন ক্ষমতা থাকে এবং যখন কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকের মধ্যে বিভেদের সীমারেখাটা খুব স্পষ্ট নয়। যে তত্ত্বে শ্রমিক এবং কর্তৃপক্ষের একত্ব প্রচার করা হয় সেক্ষেত্রে শ্রমিককে কর্তৃপক্ষের হাতের বাধ্য ক্রীড়নক হিসাবে ভাবা যেতে পারে, এই একতাটুকু দলীয়, শ্রেণীগত, জাতিগত অথবা ধর্মগত হতে পারে। কমিউনিজম এবং ফ্যাসিবাদ উভয়েই এই শ্রমিক এবং কর্তৃপক্ষের একতাটুকু স্বীকার করে এবং এরা উভয়েই স্বল্পবেতনভুক শ্রমজীবীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী কাজ আদায় করে নেয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, ফরাসী অধিকৃত কানাডা এবং আমেরিকার দক্ষিণ দেশে জাতিগত একতার ধুয়ো তুলে শ্রমজীবীদের শোষণ করা হয়েছিল। অন্যত্র আমরা দেখেছি যে জাতীয় এবং ধর্মীয় ঐক্যের ধুয়ো তুলে এই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হয়েছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একথা বলা চলে যে উৎপাদন যন্ত্রগুলির জাতীয়করণ দেশের মানুষের কাছে সম্ভাবনার চেয়েও ভীতির সংকেত বয়ে আনে। এই উৎপাদন যন্ত্রগুলির মালিকানা যারই হাতে থাক না কেন আমাদের উপরে একজন না একজন প্রভুত্ব করবেই; যা কিছু আমাদের চারপাশে আমরা দেখি তা আমাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি এবং কর্তৃপক্ষ যে আমাদের কাজ করাচ্ছেন তা আমাদের ভালোর জন্যে—এ ধরনের উক্তির বিরুদ্ধে অবশ্য আমাদের কিছু বলার থাকবে না। সমাজবাদ এবং ধনতন্ত্রবাদের যে লড়াই তা প্রধানতঃ দুটি ভিন্নধর্মী কর্তৃপক্ষের লড়াই। সমাজবাদের জন্য উৎসর্গীকৃত সমাজবাদী কি ধরনের প্রভু হয়ে উঠবেন সে কথা চিন্তা করা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আদর্শবাদী মানুষ যে দুর্জয় প্রভুর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন সেটুকু উপলব্ধি করার জন্য .কমিউনিস্ট রাশিয়ার উদাহরণকে টেনে আনার দরকার নেই। কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য যে আত্ম-উৎসর্গ তা থেকে যে নির্মম কঠোরতা জাত হয় তার তুলনায় আত্মসিদ্ধির জন্য যে কঠোরতা মানুষের মধ্যে আমরা

দেখি তা নগণ্য। ক্যালভিন বললেন যে, মহিমা অর্জন করতে হলে মানুষকে সব মানবতাবোধ বিসর্জন দিতে হবে। তাই সাধারণ মানুষ যাঁরা তুচ্ছ লাভালাভের জন্য ব্যগ্র তাঁদের তাঁবেদারি করাই ভালো; কিন্তু যাঁরা উন্নত জীবনাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, যাঁরা আদর্শের জন্য নিজেদের এবং অপরকেও বলি দিতে উৎসুক তাঁদের কর্তৃত্বাধীনে কাজ না করাই ভালো। সবচেয়ে জঘন্য নিয়োগকর্তা হলেন তিনি, যিনি স্তালিনের মতো নিজেকে শ্রমজীবীদের প্রবক্তা এবং প্রতিনিধির ভূমিকায় উপস্থাপিত করেন।

আমাদের একমাত্র কর্ম হোল শ্রমিক এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার ব্যবধানটাকে টিঁকিয়ে রাখা। আমরা চাই কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠুরূপে শ্রমিক পরিচালনা করুন এবং শ্রমজীবীও যথাসাধ্য তাঁদের স্বার্থরক্ষা করুন। কোন সমাজব্যবস্থাই আমাদের কাছে মুক্ত সমাজব্যবস্থা বলে গণ্য হবে না যদি না শ্রমিকসমাজ কর্তৃপক্ষের হাত থেকে আপনাদের স্বাধীনতাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

এই স্বাধীনতাটুকু যে সব উপাদানকে আশ্রয় করে তারা অলীক নয়। জোরদার শ্রমিক ইউনিয়ন, দেশের বৃহত্তর অংশে বিচরণের অবাধ স্বাধীনতা, ব্যাঙ্কে সঞ্চয় হিসাব খোলা, এবং আত্মমর্যাদার একটা ঐতিহ্য এসবই হোল এই স্বাধীনতার অনুষঙ্গ। এই দেশে এবং স্বাধীন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শ্রমজীবীরা এগুলি ভোগ করেন; সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রগুলিতে অবশ্য এদের দেখা পাওয়া ভার।

কমিউনিস্ট দেশগুলির বর্তমান শাসনব্যবস্থায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলি কর্তৃপক্ষের হাতের ক্রীড়নক মাত্র; সর্বপ্রযত্নে শ্রমিকদের স্থানান্তরে গমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, মাঝে মাঝে মুদ্রাপ্রথার পরিবর্তন করে শ্রমিকদের সঞ্চয়কে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়; ভীতি প্রদর্শন করে শ্রমিকের আত্মমর্যাদা বোধকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। অতএব কোন সমাজের অবাধ স্বাধীনতার পরিমাপ করতে হলে আমরা শ্রমিকের স্বাধীনতাকে তার নির্দেশক বলে গণ্য করতে পারি।

এখন প্রশ্ন হোল এই যে স্বাধীন, স্ববশ শ্রমিকসমাজ দিয়ে কার্যকরী উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা যায় কিনা? কেননা শ্রমিকের মনোবৃত্তির এবং ধরণ-ধারণ যদি উৎপাদন পন্থার পরিপূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী হয় তাহলে শ্রমজীবীর স্বাধীনতার আর কোন অর্থ থাকে না।

সান-ফ্রান্সিস্কোর ডকেতে বহুদিন শ্রমিকদের কাজ লক্ষ করে আমি এই সিদ্ধান্ত করেছি যে একেবারে স্বনির্ভর শ্রমিকসমাজ কর্তৃপক্ষের শান্তি ব্যাহত করলেও এই ধরনের শ্রমিকেরা কর্তৃপক্ষকে তাঁদেরই প্রশাসনিক সংগঠনের উৎকর্ষ সাধনে বাধ্য করে এবং কাজকর্মের গতিকে ত্বরান্বিত করে। সান-ফ্রান্সিস্কোর বন্দরের কর্তৃপক্ষ মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মী নিয়ে চল্লিশ ঘণ্টা বড় বড় জাহাজে মাল বোঝাই এবং তা থেকে মাল খালাস করছেন। ১৯৩৪ সালে বর্তমানের সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের সংগঠনের পরে যান্ত্রিক উপায়ে সব বন্দরেই কাজকর্ম চলছে; সর্বত্রই ফর্কলিফট এবং প্যালেট বোর্ড ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে চিনি, খাদ্যশস্য, সিমেণ্ট, কাঁচা লোহা এবং নিউজ প্রিণ্ট ওঠানো নামানোর সময়। প্রায় প্রতিদিনই নূতন ধরনের ব্যবস্থা এবং পুরানো ব্যবস্থার নতুন ধরনের উন্নতি প্রবর্তন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কাউকে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে না যে কর্তৃপক্ষ সব সময় কাজের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। নিশ্চয়ই এই সজাগ সতর্কতার পিছনে অন্য সব কারণ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কতকগুলি কারণ নিশ্চয়ই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেয়। কিন্তু এ কথা খুবই স্পষ্ট যে স্বাধীন শ্রমিক সমাজ সক্রিয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিপন্থী নয়। শিল্প বিপ্লবের সময়ে যে তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছিল তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে শিল্প উৎপাদনে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ অবাধ্য শ্রমিককে মোটেই বিনয়ী করে নি অন্ততঃপক্ষে এটুকু আমরা জানি যে ডকের শ্রমিকেরা তাদের নায্য পাওয়াটুকু পাবেই; যা কিছু ঘটুক না কেন তারা তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে না। যে শ্রমিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন সম্ভাবনায় তার সম্ভাব্য স্বর্গরাজ্যটি প্রত্যক্ষ করে না সে শ্রমিক নির্বোধ। দ্য টকভিল কাজের অন্তরে যে ব্যাধিটির কথা বলেছেন সে ব্যাধি মনুষ্য সমাজের উদ্ভবের প্রথম দিন থেকে তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে —যান্ত্রিক উপায়ে উৎপাদন এই ব্যাধির নিরসন করতে না পারলেও ব্যাধির যন্ত্রণার উপশম করতে পারে। আমার মতে আধুনিক প্রতীচ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে প্রতিযোগিতা চলছে তার চূড়ান্ত অবস্থা হোল এই যান্ত্রিক পথে শিল্প উৎপাদনের প্রয়াস। এখন ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধটা চলছে স্বর্গোদ্যানের প্রবেশদ্বারে। জিহোভা এবং দেবদূতের দল তাদের প্রজ্বলন্ত ঘূর্ণসমান তরবারি হাতে স্বর্গোদ্যানের দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ, আর

গু তকভিল ফরাসী দেশের ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পূর্বে যে অবস্থা ছিল সে সম্পর্কে গবেষণা করে বললেন, "একটা জাতি কোন রকম প্রতিবাদ না করে সব রকম আইনের পীড়নকে এমনভাবে মেনে নিল যেন সে আইনের অত্যাচারটুকু তার অনুভবই হয়নি; কিন্তু যেই সেই আইনের বন্ধনকে শিথিল করা হোল সঙ্গে সঙ্গে তারা হিংস্রভাবে সেই আইনের বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলে দিল।" অন্য কথায় আমরা বলতে পারি, যখন অত্যাচারটা চূড়ান্ত রূপ নেয় তখন গণ-অভ্যুত্থান ঘটে না; যখন সেটা কমে আসে তখনই অভ্যুত্থান ঘটে। তিনি এই আপাতবিরোধকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন অসন্তোষ এবং আশাবাদের মধ্যেকার সম্পর্কটুকু নির্ণয় করে:—"যখন আমরা অন্যায়টাকে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করি তখন আমরা ধৈর্য ধরে তা সহ্য করি; কিন্তু যেই তাকে এড়িয়ে যাবার পথ পাবার প্রত্যাশা করি অমনি সেই অন্যায়টুকু অসহ্য বলে মনে হয়।" হতাশা এবং দুঃখ হোল স্থাবর। গণঅভ্যুত্থানের জঙ্গমতা মানুষের আশা এবং অহমিকা থেকে জন্ম নেয়। মানুষ দুঃখে পড়ে বিদ্রোহ করে না; সমৃদ্ধতর জীবনের প্রত্যাশাই বিদ্রোহের কারণ।

এ সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় হোল এই যে, যদিও অসন্তোষ এবং আশাবাদের মধ্যেকার সম্পর্কটুকু সহজেই চোখে পড়ে তবুও মনের উপরে এর প্রভাব অল্প। বোধ হয় এটি ঘটে আমরা দু'ধরনের আশার মধ্যে গণ্ডগোল করে ফেলি:—তাৎক্ষণিক এবং দূরাশ্রিত আশা। এই তাৎক্ষণিক আশাই অর্থাৎ সে আশার পূর্তি এই হোল বলে, সেই আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে কাজে উদ্বুদ্ধ করে; দূরাশ্রিত আশা মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে রোমানদের উদ্দেশ্যে লেখা Paul's Epistle (পলের চিঠি) থেকে উদ্ধৃত করতে পারি: "আমরা যা দেখতে পাই না তা যদি আমরা প্রত্যাশা করি তাহলে আমরা ধৈর্য ধরে এর আসার পথ চেয়ে বসে থাকি।" কমিউনিস্ট সরকার এই দূরাশ্রিত আশার আলোটুকু বিশ্বাসী, ধীর স্থির শোষিত জনগণের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে এইসব সরকার নিজেদের অত্যাচারের জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে। আমরা একথা শুনেছি যে সমষ্টিবাদী কমিউনিস্ট নেতৃত্ব অত্যন্ত সহজেই তাদের মত, পথ ও নীতিকে এক প্রত্যন্ত সীমা থেকে আর এক প্রত্যন্ত সীমায় নিয়ে যায়; জনগণের প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নিয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না। কিন্তু তাঁরা

একটি জিনিস বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে করতে পারেন না; সে বস্তুটি হোল তাঁদের কোমল বা দয়ার্দ্র হওয়া এবং তার সংস্কার করা। এই প্রসঙ্গে দ্য তকভিল বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন যে, বহুদিন অত্যাচার করার পরে যদি কোন রাজা তাঁর প্রজাদের এই অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে চান তাহলে তাঁর খুব বড় ধরনের রাজনৈতিক প্রতিভা থাকা দরকার। দ্য তকভিল-এর এই মন্তব্য অনুসরণ করে আমি ১৯৫০ সালে এই মত প্রকাশ করেছিলাম যে, লোকেরা বেশ ভালোভাবে খাওয়া-পরার সুযোগ লাভের পূর্বে সোভিয়েত রাশিয়ায় কোন গণ-অভ্যুত্থান ঘটবে না। পলিটব্যুরোর শাসনকালের খুব বিপজ্জনক একটা মুহূর্ত আসবে যখন রাশিয়ার জনগণের আর্থনীতিক অবস্থার বেশ খানিকটা উন্নতি ঘটবে এবং সার্বিক লৌহশাসন খানিকটা শিথিল হয়ে পড়বে।* এবং আবার কমিউনিস্ট সরকারের পক্ষে খুব একটা বিপজ্জনক সময় আসবে যখন তাঁরা শাসনব্যবস্থার সংস্কার শুরু করবে, যখন তাঁদের মধ্যে উদারনৈতিক মতবাদের লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সার্বিকতাবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে এই ধরনের শিথিলতার যে প্ররোচনাময় ফলটুকু ফলে তা কিন্তু যথেষ্ট নয়। যদি এই তাৎক্ষণিক আশাজাত অধৈর্যকে অসন্তোষ এবং বিপ্লবের রূপ দিতে হয় তাহলে অন্যান্য কয়েকটি ব্যাপারও সংঘটিত হওয়া দরকার। যখন স্তালিনের উত্তর-সাধকরা সমষ্টি জীবনের উপরে তাদের সার্বিক কর্তৃত্ব যে কমে আসছে তার লক্ষণ প্রকাশ করতে লাগলেন তখন পশ্চিম দেশের পর্যবেক্ষক আশা করেছিলেন যে সেখানে অসন্তোষ দেখা দেবে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে জ্ঞান না থাকলে এই অশান্তি কোথায় কোথায় ঘটবে তা বলা সহজ ছিল না।

ব্যক্তিগত অসন্তোষ যতই তীব্র এবং ব্যাপক হোক না কেন তা কখনও সক্রিয় প্রতিরোধে পর্যবসিত হতে পারে না, যতক্ষণ না এই অসন্তুষ্ট মানুষেরা চিন্তা এবং ভাবনায় কোন দল অথবা গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে। এই সত্য আধুনিক কালে বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্যক্তি-মানুষ একক ভাবে যখনই সমষ্টির অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তখন তা নিরর্থক হয়েছে, হয়তো তার দুঃখ এবং অভাব-অভিযোগ খুবই তীব্র ছিল এবং সেও হয়তো তার নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে এতটুকু সন্দিহান ছিল না।

* এরিক হফার প্রণীত 'দি ট্রু বিলিভার', পৃষ্ঠা ১৮ দ্রষ্টব্য।

ধর্মদ্বেষী এই জনগণ তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রবেশদ্বারের মুখে কলরব করছে এবং জিহোভা এবং তাঁর দেবদূতদের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা সেই আদেশ মিথ্যা প্রতিপন্ন করছি যে মানুষ তার কপালের ঘাম পায়ে ফেলে তবেই দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাবে।

একথা সত্যি যে শ্রমিকশ্রেণী এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদই যাবতীয় অশান্তি ও সংঘর্ষের মূলে, কিন্তু যদি একথা বলা হয় যে শান্তিই হোক পরম কাম্য, তাহলে সেখানে সন্দেহের অবকাশ থাকবে। স্বর্গত উইলিয়াম র‍্যানডলফ হার্স্ট অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ উক্তি করেছিলেন :—"যা শান্ত তা অশান্তের গহ্বরের মধ্যে চলে যায়।" ভালো করবার, এগিয়ে যাবার নিত্য প্রচেষ্টা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, দুটি বিকল্পের মধ্যে অবসর মতো একটিকে বেছে নেওয়ার ফলেও এটি লাভ করা যায় না। মনুষ্যলোকে প্রগতির মূলে রয়েছে কোন কিছুকে ফেলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা। যে আদর্শ সমাজে নেকড়ে বাঘ এবং মেষশাবক একই সঙ্গে বাস করে সে সমাজ হোল বদ্ধ সমাজ।

দশম পরিচ্ছেদ

কমিউনিস্ট দেশগুলিতে গণ-অভ্যুত্থান

স্তালিনের মৃত্যুর পরে কমিউনিস্ট দেশগুলিতে যে সব গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে সে সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হোল এই যে, পশ্চিম দেশের মানুষেরা এটি প্রত্যাশা করেন না। আমরা এই যে সম্পূর্ণ আশ্চর্য হয়েছি এর অর্থ হোল, কমিউনিজমের অশুভ শক্তিকে আমরা ভয় করি। আমরা একথা বিশ্বাস করি, মানুষের মন গড়া এবং মন ভাঙ্গা—এ-দুটি কাজেই কমিউনিজমের সীমাহীন শক্তি রয়েছে। একদিকে যেমন উদ্ধত এবং সাহসী মানুষগুলিকে কমিউনিজম বুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এবং তাদের দিয়ে অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য সব স্বীকারোক্তি করিয়ে নিতে পারে, ঠিক তেমনি ধারা ভয়ে অর্ধমৃত এবং আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য এক বৃহৎ জনসমাজকে জাতীয় স্বার্থ এবং মাতৃভূমি রক্ষার জন্য প্রায় ধর্মোন্মাদনার মত এর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে ; শুধু তাই নয়, যারা এঁদের নিন্দা করছে এবং যারা এদের শোষণ করছে তাদের জন্যে এরা প্রাণটুকুও দিতে পারে। মানুষের মনোবিকারের এই বিস্ময়কর ব্যাপারটুকু আমরা বারবার প্রত্যক্ষ করেছি ; কমিউনিস্ট সরকারের বশ্যতা-বদ্ধ লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁদের অত্যাচারীদের প্রশংসা করছে এবং একই সঙ্গে তারা বাইরের জগৎকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছে।

তবুও এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হোল এই যে কমিউনিস্ট অশুভের অসীম শক্তির কথা মনে রাখা সত্ত্বেও আমাদের স্তালিনোত্তর রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং প্রচারবিদদের স্তালিনোত্তর পূর্ব ইউরোপের অশান্তি সম্বন্ধে অতখানি নিরুদ্বেগ থাকা সমীচীন হয়নি। কেন না লৌহ যবনিকার ওধারে যে গণ-অভ্যুত্থান হতে পারে এবং কোন্ কোন্ দেশে সেই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম প্রকাশ ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক সম্ভাব্য তত্ত্বকথা আমাদের অত্যন্ত সহজলভ্য ছিল। এ সম্বন্ধে তত্ত্বগতভাবে যা বলা যায় তা আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

ইউরোপের সর্বত্রই মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারে। এই যে ইউরোপের উজ্জ্বল ছবি এর পাশে রাশিয়া হোল একটা মস্ত বড় বস্তি, এশিয়া হোল একটা প্রকাণ্ড কবরখানা এবং আমেরিকা তাদের গৌরবের বস্তু. কেননা ইউরোপের যে অবাঞ্ছিত মানুষেরা আমেরিকায় গিয়েছিল আমেরিকা হোল তাদেরই সৃষ্টি।

এই যে ভাবরূপের কথা বললাম এই ছবিটি আপনা-আপনি রূপ পায় না। ইউরোপের অকমিউনিস্ট অংশে এই ছবিটিকে তুলে ধরতে হবে একটি শক্তিশালী আন্দোলনের মাধ্যমে। রাশিয়ার সীমান্তের বাইরে ইউরোপীয় ভূখণ্ডের প্রতি ইঞ্চি জমিতে এই আন্দোলনকে শিকড় গেড়ে বসতে হবে। বন্দী জনসমাজকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমরা তাদের পরিত্যাগ করিনি, তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ইউরোপের মানুষেরা তাদের নিজের রক্তমাংসেরই শামিল মনে করে এবং কমিউনিস্ট শাসন একটি দুঃস্বপ্ন মাত্র।

এই ধরনের আন্দোলন না থাকলে কমিউনিস্ট আধিপত্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে বাইরের কোন দেশের সঙ্গে একাত্মবোধ করলেও তা প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে উঠতে পারবে না। এখন অবস্থার গতিক যা তাতে মনে হয় যে, এই লক্ষ লক্ষ বন্দী মানুষের অন্তরে সাহস সঞ্চার করে তাদের বেপরোয়াভাবে বিদ্রোহী করে তোলা কোন জীবন্ত মানুষের কর্ম নয়; মৃতের প্রেতাত্মা হয়তো এটুকু সম্পন্ন করতে পারে। সার্বিক উৎপীড়ন-মূলক শাসনব্যবস্থা এক ভীতিপ্রদ প্রকরণের প্রয়োগে ব্যক্তিমানুষের আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি হরণ করে নিয়েছে; এগুলি না থাকার ফলে তার স্বাধীনতা এবং আত্মসম্মানজ্ঞান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সব রকমের বিকল্প এবং আশ্রয় থেকে সে বঞ্চিত।—নৈঃশব্দ্য এবং নিঃসঙ্গতাও তাকে ত্যাগ করেছে। সে যে শুধু বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাই নয়, তার নিজের প্রতিবেশী বন্ধু এবং আত্মীয়েরাও তার আশ্রয় না হয়ে তার ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। সে একেবারে বন্ধুহীন, একা এবং অরক্ষিত, কথার ইন্দ্রজাল বুনেও তাকে কেউ তার এই পরিপূর্ণ একাকিত্বের মধ্যে শক্তি যোগায় না। কেননা স্তালিন সব শক্তিগর্ভ বাক্যকে বিনষ্ট করেছেন এবং "সম্মান", "সত্য", "ন্যায়", "স্বাধীনতা", "সাম্য", "ভ্রাতৃত্ব", এবং "মানবতাবাদ" এইসব কথাগুলির প্রাণরসটুকু নিঃশেষে নিংড়ে নিয়েছেন। শুধু রয়েছে মৃত

পূর্বপুরুষেরা, এঁদের রক্ত তার ধমনীতে, এঁদের আত্মা তার দেহের প্রতিটি কোণে। আমরা মৃত অতীতের কথা প্রায়ই শুনি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি নবজাগরণের মূলে রয়েছে এই মৃত অতীত ; যখন পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তখন এই অতীতের স্মৃতিই অনন্যসাধারণকে প্রেরণা যোগায়। উগ্র জাতীয়তাবাদের বর্বরতা আমাদের একথা শিখিয়েছে যে কোন জাতি যদি তার অতীত ইতিহাস নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তবে তা সামাজিক ব্যাধি অথবা অন্যায় হিসাবে গণ্য হবে। কমিউনিস্ট উৎপীড়নের আত্মা-অবক্ষয়ী দূষিত বাষ্পে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিমানুষের বাঁচবার একটিমাত্র পথ হোল গর্বোন্নত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগরক্ষা ; তাকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণানুগ কাঁচা মালে পরিণত করার ভীতিপ্রদ পদ্ধতিকে রোধ করার এই একটি-মাত্র পথ। হাঙ্গেরী এবং পোল্যাণ্ডে এই সর্বশক্তিমান মৃত পূর্বপুরুষেরা কি ভাবে যে এক দশকের অক্লান্ত কমিউনিস্ট প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিলো তা দেখে অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় ; কিভাবে দেশের যুবসমাজ এবং বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য এঁরা আকর্ষণ করলো তা অনুধাবনযোগ্য ; যদিও আমরা জানি যে এই যুবসমাজ এবং বুদ্ধিজীবীরাই কমিউনিস্ট ইন্দ্রজালে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো একথা বলা যায়: "যে জাতির ইতিহাস নেই সে জাতির মানুষেরা সুখী। কিন্তু যখন পৃথিবীতে একজন হিটলার অথবা একজন স্তালিনের আবির্ভাব হয় তখন যদি কোন প্রতিস্পর্ধী পূর্ব-পুরুষ না থেকে থাকে তাহলে সে জাতির পক্ষে খুব শুভ হয় না ; এই পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ না করলে এবং তাঁদের অদম্য আত্মার শক্তিটুকু নিজের ধমনীতে অনুভব না করলে সে জাতির মানুষদের মঙ্গল হয় না।

একক অস্তিত্বের মধ্যে শক্তির কোন উৎস নেই ; অনন্ত শক্তির আধার যে সমগ্রতা তার অংশ রূপে নিজেকে ভাবলে এই শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধরনের সার্বিকতাবাদী যান্ত্রিক শাসনের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে অস্বীকার করার অসীম সাহসটুকু আমরা দেখাতে পারি, বিশ্বাস এবং অহমিকাবোধ আমাদের এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে যদি আমরা নিজেদের এই অনন্ত শক্তির অংশ বলে মনে করি। এবং যেহেতু কমিউনিস্ট রাজত্বে বিরোধী আন্দোলন অথবা মতবিরোধের সম্ভাবনাটুকু গুপ্ত পুলিশ এবং পারস্পরিক অবিশ্বাসের জন্য একেবারে সত্য হয়ে উঠতে পারে না, তাই একথা বলা চলে যে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে তখনই যখন জনগণ কমিউনিস্ট রাজত্বের বাইরের কোন উজ্জ্বল আদর্শের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ভাবতে পারে অথবা নিজেদের গৌরবময় অতীতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারে।

স্তালিন এটুকু বুঝেছিলেন বলে বাইরের কোন জীবনাদর্শের সঙ্গে জনগণকে একাত্ম হতে দেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার কমিউনিস্ট এলাকার বাইরের মানবসমাজ-সংক্রান্ত সকল সচেতনতার বিলোপ সাধন। জনগণের চোখের সামনে থেকে বাইরের জগৎকে নিঃশেষে মুছে দেওয়া। তাঁর অপপ্রচার জোর গলায় একথা বলেছিল যে অ-কমিউনিস্ট সরকারেরা তাদের জনগণকে দুঃখে বঞ্চনায় ক্লীবত্বে অধঃপতিত করে রেখেছে। তাদের মধ্যে প্রশংসা বা শ্রদ্ধা করবার মতো কিছুই নেই ; তাদের সঙ্গে অভিন্নতা বোধ করার কোন অবকাশ নেই।

লৌহ যবনিকার উদ্দেশ্য ছিল বন্দী-জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন কোন ক্রমেই বাইরের জগতের কাছে পৌছাতে না পারে। বাইরের জগৎ থেকে গুপ্তচরদের এবং তাদের প্রতিনিধিদের ঢুকতে না দেওয়ার চেয়ে ওটাই ছিল ওদের নিগূঢ়তর উদ্দেশ্য। কমিউনিস্ট দেশ থেকে সর্বপ্রযত্নে দেশত্যাগ করে বহির্গমন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোল ; বিদেশীকে বিয়ে করে রুশ মেয়েরা যে বেরিয়ে আসবে তারও পথ রইল না, বাইরের জগৎ যেন আর এক গ্রহ। টিটোপন্থীদের এবং সমাজবাদী সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্তালিনের যে প্রচণ্ড বীতরাগ ছিল তার মূলে এক ধরনের ভয় ছিল যে কমিউনিস্ট জগতের সম্ভাব্য বিরুদ্ধবাদীরা হয়তো এদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে। রাশিয়ার সামান্য

কয়জন ইহুদীরাও যে মনে মনে ছোট ইজরায়েল রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম মনে করবে এটাও তিনি চাননি; তাই তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিষোদ্গার করতে শুরু করে দিলেন।

এখন এ কথাটা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে কমিউনিস্ট তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পূর্ব জার্মানী বাইরের জগতের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ব্যাপারে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। তাদের দেশের পশ্চিমার্ধের স্বাধীন এবং সমৃদ্ধিশালী মানুষদের সঙ্গে তাদের যোগ ছিল এবং পশ্চিম বার্লিনের যোগসূত্রের মাধ্যমে তারা বাইরের মানব-সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। স্তালিনের মৃত্যুর পরে যে শাসনশৈথিল্য দেখা গেল তার ফলে বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের ঐক্যানুভূতি বৃদ্ধি পেল তাদের তাৎক্ষণিক আশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে; তাই তাদের অসন্তোষটুকু গণ-অভ্যুত্থানে পবিণত হবার সম্ভাবনায় উজ্জ্বলতব হয়ে উঠল।

অন্যান্য তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির কি অবস্থা হোল?

বাইরের জগতের প্রতিবেশী যে সব কমিউনিস্ট দেশ ছিল তাদের মানুষদের পক্ষে বাইরের জগতের সঙ্গে এই ঐক্যানুভূতি সহজ হয়ে উঠল। হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ডের অসন্তুষ্ট জনগণ বাইরের জগতের কোন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়টির প্রতি আকৃষ্ট হবে, তার সঙ্গে একাত্মবোধ করবে? স্বাধীনতাপ্রিয় মানবতার ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট, আমেরিকা তাদের কাছে সুদূর এবং ঝাপ্‌সা; সে দেশকে তারা হয়তো আপনার বলে ভাবতে পারে না। আজকের দিনেব পশ্চিম ইউরোপ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ; সমষ্টিমূলক শাসনব্যবস্থার প্রহরীদের সতর্ক শাসনে নিত্যপীড়িত ব্যক্তি-মানুষের আশা এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক করার শক্তি নেই এই পশ্চিম ইউরোপের।

আমার মনে হয় এই তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মানুষেরা সমগ্র ইউরোপের যে ঐক্যবদ্ধ ভাবরূপ প্রত্যক্ষ কবেছিল তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারতো। সৌন্দর্যে, শক্তিতে এবং প্রতিভায়, নৈপুণ্যে এবং জ্ঞানে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের চেয়ে অগ্রগামী; কীর্তিতে এবং মহিমায় এর ইতিহাস অনন্য; এই সুসংহত উপমহাদেশে মানুষেরা স্বেচ্ছায় কাজ করতে পারে, খেলা করতে পারে, লেখাপড়া করতে পারে, শিক্ষকতা করতে পারে, বাড়ীঘর নির্মাণ করতে পারে, ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারে এবং ইচ্ছামতো ভ্রমণ করতে পারে; এই

যে অনুমোদনটুকু শুধুমাত্র পিঠে হাত বুলিয়ে পাওয়া যায়। এর জন্য প্রয়োজন আত্মসম্মানজ্ঞানহীন মানুষের, যে মানুষেরা তাকেই ভালোবাসবে যাকে সে ঘৃণা করতো এবং তাকেই ঘৃণা করবে যাকে সে ভালোবাসতো। বোরিস্ প্যাস্তেরন্যাক যথার্থই বলেছেন যে, সব কমিউনিস্ট সরকারই এটি চান।

এ যুগে অকমিউনিস্ট দেশগুলিতেও মানুষের পক্ষে আত্মসম্মানটুকু রক্ষা করা শক্ত; অনুন্নত দেশগুলিতে মানুষেরা নিজেদের অনগ্রসরতা সম্বন্ধে এতখানি সচেতন যে খুব অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও সেই জীবনের সৌম্য প্রসন্নতাটুকু লাভ করা সম্ভবপর হয় না, নিজের মূল্য সম্বন্ধে অসংশয়িত বিশ্বাসটুকুই এই প্রসন্নতা দান করে। অনুরূপভাবে জাতীয় এবং ধর্মীয় বিভেদ যেখানে প্রকট সেখানে ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়। অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়েই দুস্থ। অত্যাচারিত, তাদের বিরুদ্ধে যে পূর্বসংস্কার রয়েছে তার দ্বারা তিলে তিলে বিনষ্ট হয়; অত্যাচারী অপরের মধ্যে যে ভয়ের সঞ্চার করে সেই ভয়ের দ্বারা অভিভূত হয়। সবশেষে বলা যায় প্রগতিশীল এবং সাম্যবাদী সমাজেও লক্ষ লক্ষ লোক তাদের মূল্যবোধটুকু হারিয়ে ফেলে; এটি ঘটে বেকারত্বের মাধ্যমে এবং কারিগরী বিদ্যায় বৈপ্লবিক প্রগতি সাধিত হওয়ায় তাদের কারিগরী বিদ্যা অকেজো হওয়ার ফলেও।

অতএব আমাদের মনে হয় যে বর্তমানে পৃথিবীর অবস্থা যা তাতে করে মানুষেরা যতই পরস্পরকে জানবে এবং যতই তারা পরস্পরের মতো হয়ে উঠবে ততই তাদের সমগ্র মানবসমাজের একতা সম্বন্ধে বোধটুকু আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। দূরের দিগন্তে যখন মানুষের ভাবমূর্তিটিকে মসীবর্ণ ছায়া পরিলেখের মতো দেখি তখন তা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। যখন আমার প্রতিবেশী মানুষের কাছাকাছি আমি তখন তার চোখে আমাদের নিজেদের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করি। সেখানে যা দেখি তা পছন্দ করি না।

আত্মসম্ভ্রমটুকু অলভ্য হলে তার ফল বিষময় হয়। মানুষের জীবনে কোন মৌল অঙ্গের অভাব ঘটলে আমরা তার বিকল্প ব্যবস্থা চাই এবং এই বিকল্পকে আমরা অত্যন্ত উগ্র আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করি, কেননা আমরা নিজেদের বোঝাই, যে বিকল্পটাকে গ্রহণ করছি সেটাই শ্রেষ্ঠ। অতএব লুপ্ত আত্মপ্রত্যয়ের মূলে অন্ধ বিশ্বাসকে বসাই; আশার স্থলে অতৃপ্ত কামনাকে বসাই; বুদ্ধির স্থল নেয় মজুতদারী; উদ্দেশ্যমূলক কাজের জায়গায় বসে

কর্মচাঞ্চল্যের উন্মাদনা ; অলভ্য আত্মসম্ভ্রমের স্থান নেয় অহমিকা। সারা পৃথিবীতে আজকে যে ধরনের অহংবোধ ছড়িয়ে পড়েছে তা হোল যে একটি বিশেষ ব্যক্তি একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সভ্য—এই গোষ্ঠী রাষ্ট্র হতে পারে, জাতি হতে পারে, চার্চ অথবা দলবিশেষ হতে পারে। এই মনোভাবটি মনুষ্যজাতির একত্বকে ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং এরই ফলে আমাদের কালের বর্বর দ্বন্দ্ব সংঘাতের উৎপত্তি।

ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশে শুভেচ্ছা এবং শান্তি তাদের বাসা বাঁধে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ের কথা হোল এই যে আমাদের উপযোগিতা এবং মূল্যমানের বর্তমান ধারণা নিয়ে আমরা একথা জোর করে বলতে পারি না যে, আর্থনীতিক এবং সামাজিক উন্নতি ব্যক্তিমানুষের বিকারগুলি দূর করে দেবে। নতুন শিল্পবিপ্লব সকলের জন্য অভাবিতপূর্ব প্রাচুর্যের সম্ভাবনাটুকু আমাদের সামনে তুলে ধরেছে এবং স্বাধীন জগতের মানুষেরা—যদিও তারা বিপুল সংখ্যায় বেকার থাকে তবুও তাদের জীবনে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের অংশভাগী হবে। কিন্তু যদি উপযোগিতা, মূল্য এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তন না হয় তাহলে শুধুমাত্র আর্থনীতিক প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে মানুষের সহনশীলতা এবং উদারতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে না।

আমাদের মূল্যবোধের ধারণা, প্রাচুর্যের বোধ এবং অবকাশ সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব এরা সকলেই জাতীয় এবং বর্ণগত বিচ্ছেদ প্রবণতাকে বর্ধিত করবে। যারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এবং অল্প বেতন পায় তারাই শুধুমাত্র ডি. এ. আর. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয় তা নয়। অলস মানুষেরা যারা দেশের প্রাচুর্যটুকু ভোগ করে তাঁদের উপযোগিতা এবং নিজেদের সম্বন্ধে অসংশয়িত উচ্চ ধারণার প্রয়োজনীয়তাটুকু অতিমাত্রায় বিস্ফোরক প্রকল্পের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

একটা দেশের মানুষের পারদর্শিতার পরিমাপ করা হয়, কি পরিমাণে সেই দেশের মানুষদের সম্ভাবনাটুকু সত্য করে তোলা যায় তা দিয়ে। শিল্প, কৃষি এবং প্রাকৃত সম্পদের ব্যবহার করে মানুষের বুদ্ধিগত শৈল্পিক এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে সার্থক করে তুলতে পারলে তবেই তা নিঃসংশয়ে গ্রহণ-যোগ্য। বর্তমানে নতুন শিল্প-বিপ্লব আমাদের কর্মপন্থার দুরূহতাটুকু সহজ করে

একাদশ পরিচ্ছেদ

সৌভ্রাত্র

আমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসার চেয়ে সমগ্র মনুষ্যসমাজকে ভালবাসা সহজ; প্রতিবেশীকে ভালবাসা এবং মনুষ্যসমাজকে ভালোবাসা এতদুভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ থাকতে পারে; সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন হয়তো তাঁরা করতে পারেন যারা তাঁদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে হয়তো সৌহার্দ্যটুকু রক্ষা করতে পারেন না। প্রায় একশো বছর আগে পেত্রাশেভস্কি নামে একজন রুশীয় জমিদার একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত করেছিলেন—"নারী ও পুরুষদের মধ্যে কোন কিছুতেই আসক্ত হবার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে আমি মনুষ্যসমাজের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছি।" তিনি ফুরিয়ে-র* অনুগামী হলেন এবং তাঁর নিজের জমিদারীতে একটি ফ্যালানস্টেরি-র† প্রতিষ্ঠা করলেন। এই পরিমাণ কার্যের ফল বড মর্মান্তিক হোল, পেত্রাশেভস্কির প্রতিবেশী চাষীরা ফ্যালানস্টেরিটি পুড়িয়ে দিল। এই রকম একটা পরিণতিই আশা করা গিয়েছিল।

আমাদের সমকালীন অধিকাংশ ভয়াবহ অত্যাচারই মানুষের সেবার নামে অনুষ্ঠিত হয়েছে; প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে এটিকে সম্ভব করা হয়েছে। সার্বিকতাবাদী শাসনব্যবস্থার যে চোখ সব কিছু দেখে সে চোখটি হোল প্রতিবেশী সন্ধানী চোখ। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসাকে বিপ্লবের পরিপন্থী বলা যেতে পারে। মাও-সে-তুং বলেছেন যে, এটি হবে উদারনৈতিকদের পক্ষে অন্যায় যদি তারা

* ফ্রাসোয়া মারি শার্ল (১৭৭২-১৮৩৭)—ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক, লেখক এবং সংস্কারক—অনুবাদক।

† ফ্যালানস্টেরি—ফুরিয়ে-র মতবাদ অনুসারে যে স্থানে প্রায় ১৮০০ লোক গৃহাদি নির্মাণ করে একত্রে বাস করত এবং সকলে মিলেমিশে সমভাবে সম্পত্তি ভোগ করত তাকে বলা হত ফ্যালানস্টেরি।

তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সহপাঠী এবং প্রিয়জনদের দুষ্কর্মের খবর না দেয়। প্রতিবেশীদের মধ্যে সংহতি স্থাপনের অর্থ হোল সমাজে সার্বিকতাবাদের প্রসার রুদ্ধ করে দেওয়া।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে মানিয়ে চলা মূলতঃ আমাদের নিজেদের সঙ্গে মানিয়ে চলার শক্তির উপর নির্ভরশীল। আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন তাঁর নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে সহনশীল হবেন তেমনি তাঁর প্রতিবেশীর ত্রুটি-বিচ্যুতিকেও তিনি সহ্য করবেন ; নিজের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা আপনার প্রতি ঘৃণারই রূপান্তর ; যখন আমরা নিজেদের অপদার্থ বলে বুঝতে পারি তখন স্বভাবতঃই অন্যেরা আমাদের চেয়ে ভালো বলে আশা করতে পারি। নিজেদের কাছে আমাদের যা প্রত্যাশা তার থেকেও বেশী প্রত্যাশা থাকে তাদের কাছ থেকে। তাদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা যেন পূর্ণ না হয় এটাই আমরা ইচ্ছা করি। আত্মসম্ভ্রমবোধের অভাব হলে অভদ্রতা বেড়ে যায়।

আমাদের যুগের এটা একটা বিপর্যয়ের কারণ যে ভৌগোলিক এবং সামাজিক ব্যবধান দূর হয়ে গিয়ে সমস্ত রাষ্ট্র, জাতি এবং শ্রেণীর সকল মানুষকে পরস্পরের প্রতিবেশী করে দিয়েছে এবং এরই ফলে ব্যক্তির পক্ষে আত্মসম্মান রক্ষা করার ব্যাপারে হিমালয়প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর কমিউনিস্ট দেশগুলিতে সরকারী নীতি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যার ফলে বাস্তব এবং কাল্পনিক প্রতিপক্ষদের মূলোচ্ছেদ করা হয় এবং দেশের সমগ্র জনসমাজকেই ইচ্ছামতো যাতে পরিচালনা করা যায় সেইভাবেই তাদের গড়ে তোলা হয়। কমিউনিস্ট সরকার আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকদের বরদাস্ত করে না ; কেন-না তাঁরা তাঁদেব স্বদেশবাসীর সঙ্গে ব্যবহারের কতকগুলি মান বা রীতিনীতি ভঙ্গ করে না। এই ধরনের মানুষ যদি স্বল্পসংখ্যকও হয় তাহলে তাঁরা সমগ্র জনসমাজকে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত করে দেয়। উনিশ শতকের দার্শনিক আমিয়েল লিখলেন ঃ “সব রকমের স্বৈরাচারই মানুষের মর্যাদা এবং স্বাধীনতাটুকুকে বিনষ্ট করতে চায়।”

যে স্বৈরাচার তত্ত্বগত তার বিরোধিতা আরও সুস্পষ্ট। তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবিতায় এঁদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকার ফলে শুধুমাত্র বশ্যতা স্বীকার করলেই এই স্বৈরাচারীরা সুখী হন না ; এঁরা বিশ্বাস করেন যে এই তত্ত্বই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে ; জোরজবরদস্তি করে এঁরা জনগণের অনুমোদন আদায় করেন,

প্রভাবশালী ক্যাথলিক চার্চ সেখানে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। অবশ্য এ দুটির কেউ-ই ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য মাথা ঘামায় না। পোল্যাণ্ডের এই বর্তমান অবস্থা মধ্যযুগের শেষের জগতের অবস্থার সাথে তুলনীয়; কেননা সে-যুগে চার্চ এবং রাষ্ট্র এরা উভয়েই আপন আপন আধিপত্য বিস্তারের জন্য পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী লড়াই করছিল। এরই ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্মের জন্য প্রস্তুতিটুকু পূর্ণ হোল।

পশ্চিম মহাদেশে স্বাধীনতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি শাখায়িত হয়ে বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়লো। ধর্মীয় এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রভুত্বশক্তি থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রনীতিক, আর্থনীতিক এবং বুদ্ধিগত ইত্যাদি নানান ভাগের শক্তির বিভাজন ঘটল; প্রত্যেকটি বিভাগের নানান উপ-বিভাগ ছিল; চার্চ. দল, সংস্থা, আইনসভা, আদালত প্রভৃতি সংস্থায় শক্তি কেন্দ্রীভূত হোল। শক্তিকে কায়েম করাব বিরুদ্ধে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হোল তার মধ্যে রইল নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচনপ্রথা এবং আয়কর ও উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি করের মাধ্যমে মাঝে মাঝে জোর করে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ,-এরও ব্যবস্থা রইল। অবশ্য এই ব্যবস্থার বিপর্যয় হোল বিংশ শতাব্দীতে সার্বিকতাবাদী রাষ্ট্রগুলির অভ্যুত্থানের ফলে। সার্বিকতাবাদ সরলীকরণে বিশ্বাস করে; মানুষের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, অনুরাগ প্রভৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে, বিভিন্ন ধরনের মানুষের এবং বিভিন্ন ধরনের শক্তিকেন্দ্রের চরিত্র ক্ষুণ্ণ করে তাঁদের সমীকরণ করা হয়। সমষ্টিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শক্তির একটাই রূপ; পরাজিত ব্যক্তি, তা সে তিনি যতই প্রতিভাবান হোন না কেন তাঁর পক্ষে কোন প্রতিকার পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং একথা পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে সুসম্বদ্ধ কার্যকরী বিরোধী দলের দরকার আছে। সহজ অবস্থায় যে সমাজে সবাই একমত না হয়ে কাজ করতে পারে না তারা স্বাধীনতার অযোগ্য। একথাও বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে কার্যকরী বিরোধী দল এবং স্বাধীন মানুষদের ক্রিয়াকলাপ সামাজিক অবস্থার উপর খুব বেশী চাপ দেয়। যে সমাজের জঙ্গমতা অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল এবং যে সমাজে একতার একটা ঐতিহ্য আছে তার পক্ষেই বিভিন্ন দলের অবিশ্রাম অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং স্বাধীন ব্যক্তিদের ইচ্ছার সংঘাত সহ্য করা সম্ভব। এদের শাসনব্যবস্থা, আর্থনীতিক ব্যবস্থা এবং দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহ অত্যন্ত

সুষ্ঠুভাবে চলা চাই ; স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া চাই এই সমাজে। এর অর্থ হোল এই যে স্বাধীন সমাজের মানুষদের সর্ববিষয়ে পারদর্শী হওয়া চাই। যন্ত্রবিদ্যা, রাজনৈতিক ও সামাজিক মুন্সীয়ানা, এগুলির বহুল প্রচার ও আয়ত্তীকরণ দুর্যোগের দিনে সমাজজীবনকে সুস্থ রাখে এবং সব রকমের অত্যুৎসাহ পরিহার করে ঠিকমতো কাজ করতে পারে। অতি উৎসাহ ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করে, আবার খুব বেশী মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ এবং খবরদারীও ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে। সত্যিকারের স্বাধীন সমাজে অতি সাধারণ মানুষেরা সহজ ভাবে বড় বড় কাজ করে ফেলেন; অতি সাধারণ অবস্থায় এটি সম্পন্ন করা হয়, কোন অস্বাভাবিক অবস্থার প্রয়োজন হয় না। একথা পরিশেষে বলা চলে যে, সমাজ খুব সমৃদ্ধিশালী না হলে সমাজের লোকেদের আপন আপন শক্তির বিকাশ সাধন করা, সহজাত প্রবণতার অনুসরণ করা সম্ভব হয় না; পরিমাণ নিরীক্ষণ করতে গেলে যে অপচয় হয় সেটুকু সহ্য করার মতো সমাজে শক্তি থাকা চাই। বিফল হবার সুযোগ যদি মানুষকে না দেওয়া হয় তাহলে বলব সে সমাজে সত্যিকারের স্বাধীনতা নেই।

এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই যে ব্যক্তিস্বাধীনতা যে পরিমাণে সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটায় এবং বিশেষ করে সাধারণ মানুষকে কাজে মাতিয়ে তোলে তার জুড়ি মেলা ভার। দ্য তকভিল বলেছেন, "ব্যক্তি-স্বাধীনতা সমাজদেহে এক অদ্ভুত ক্রিয়াশীলতা এনে দেয়। এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক গতি ও শক্তি সমাজে উদ্ভূত হয় যা অসাধ্য সাধন করে।" কিন্তু কেবলমাত্র বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে এই শক্তির উৎসটিকে কাজে লাগানো যায়: ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখার মতো শক্তি সমাজে থাকা চাই, সামাজিক ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এমন হওয়া চাই যা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে। অতএব কোন একটি অনুন্নত দেশের পক্ষে স্বাধীনতার আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে অতি দ্রুত আধুনিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলা সহজ হবে না এবং সেটুকু প্রত্যাশা করাও অসমীচীন হবে। এদের দারিদ্র্য, কারিগরি নৈপুণ্যের অভাব এবং এদের একতাবদ্ধ হবার জন্য উৎসাহ—এসবই এর পরিপন্থী। অবশ্য পুয়ের্তরিকো এবং ইজরায়েলের মতো দেশে, যেখানে মূলধন এবং কারিগরী বিদ্যার অপ্রতুল কখনও ঘটেনি, সেখানে দ্রুত আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে প্রভূত পরিমাণ ব্যক্তিস্বাধীনতা সত্ত্বেও।

দিয়েছে ; আমরা নিশ্বাস ফেলবার সময় পেয়েছি : আমাদের একথা মনে রাখা উচিত যে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হোল আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করা— মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিভার এবং শক্তির পূর্ণ উদ্বোধন ঘটানো। যে জনসমাজ এই লক্ষ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত তারা হয়তো আবশ্যিকভাবে দয়ার প্রাচুর্যে উপচে পড়বে না, কিন্তু এরা নিশ্চয়ই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বকীয়তা ঘোষণা করে আপনার জাতি, বর্ণ অথবা তত্ত্বের মূল্য প্রমাণ করতে উদ্যোগী হবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রসঙ্গে

একথা সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, সমাজে যদি ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে হয় তাহলে এমন কতকগুলি শক্ত সমর্থ মানুষের প্রয়োজন হয় যাঁরা নিজেদের অধিকার রক্ষা করবার জন্য লড়াই করবেন। একথা আমাদের বলা হয়েছে যে, সীমাহীন সতর্কতা হোল স্বাধীনতার মূল্য এবং তারই স্বাধীন থাকা সাজে যে এটিকে প্রতিদিন অর্জন করে। একটি স্বাধীন সমাজে এই ধরনের উক্তিগুলির যৌক্তিকতা কতখানি তা ভেবে দেখা দরকার। ব্যক্তির সজাগ সতর্কতার উপরে কী তার স্বাধীন থাকা বা না থাকা নির্ভর করে? যাকে সদাসর্বদা সতর্ক থাকতে হয় এবং এইভাবে নিজের স্বাধীনতাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে হয় সে কি সত্য সত্যই নিজেকে স্বাধীন বোধ করতে পারে?

পাসকাল বলেছিলেন যে, আমাদের ধর্মের প্রতি অনুরাগের জন্য আমরা ধার্মিক হয়ে উঠি না, দুটি ভিন্নধর্মী অধর্মের অবস্থিতির জন্যই এটা ঘটে। একটি পাপকে আর একটি পাপ নিবৃত্ত করে এবং এর ফলে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তা থেকেই ধর্ম উপজাত হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্পর্কেও বোধ হয় এই ধরনের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে। আমাদের নিজেদের শক্তিবলে আমরা স্বাধীন হই না, বরং দুটি বিরুদ্ধ শক্তির মুখোমুখী হওয়ার ফলে আমাদের স্বাধীনতা লাভ ঘটে। প্রায় সমান দুটি বিরুদ্ধশক্তির দল অথবা সংস্থার দীর্ঘায়িত বিরোধের ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাত হয়; প্রতিদ্বন্দ্বীদের গুণাগুণ এক্ষেত্রে অবান্তর। দুটি প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থার দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা উদ্ভূত হয়; আবার একটি প্রতিক্রিয়াশীল ও অন্য একটি উদারনৈতিক সংস্থার ঘাতপ্রতিঘাতেও এটির জন্ম হতে পারে। বর্তমান কালে কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ডে আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত দেখেছি; এটি ঘটার কারণ শক্তিমান কমিউনিস্ট পার্টি এবং

অনুন্নত দেশগুলির আধুনিকীকরণ ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্যও কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে। বুদ্ধিজীবীর শিক্ষা দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করা এবং পরিচালনা করার ব্যাপারে যে প্রবণতা আছে তা এক ধরনের বিধিবদ্ধ সমাজজীবনের প্রবর্তন করে ; তাছাড়া একটা চমকপ্রদ কিছু করার আকাঙ্খা মানুষের মনে এক ধরনের উগ্র গুরুত্ববোধ এনে দেয় যা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। সমাজের অতি সাধারণ কৃতিগুলোকে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যেন তারা "প্রমিথিয়সের দ্বারা সম্পাদিত অসাধ্য সাধনের তুল্য * যেন তারা মহিমান্বিত পরাজয় এবং বিয়োগান্ত মহাকাব্যের প্রতিচ্ছবি"—এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেন বুদ্ধিজীবী। মহাবীর এবং সাধু-সন্তদের পক্ষে নাটকীয় পবিস্থিতির সংঘাতময় আবহাওয়া হয়তো অনুকূল হতে পারে, কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তি মানুষের পক্ষে আপন শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যক্তি-জীবনকে গঠন করার পক্ষে এই ধরনের আবহাওয়া মোটেই অনুকূল নয়। এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে একটি প্রাগ্রসর দেশে জাগরণোন্মুখ একটি অনুন্নত দেশের সব লক্ষণই ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে যদি সে দেশের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বুদ্ধিজীবীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। সমাজকে যথার্থ স্বাধীনতা দেওয়ার চেয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করাটাই হোল বুদ্ধিজীবীদের কাছে বড় কথা ; বুদ্ধিজীবী "স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করবে, বক্তৃতা করবে এবং লড়াই করবে ; স্বাধীনতা পাওয়ার চেয়ে এগুলি বেশী দরকারী তার কাছে।" সত্যি কথাটা হোল এই যে আজ পর্যন্ত স্বাধীন সমাজে বুদ্ধিজীবীরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারে নি। তাকে স্বাধীন সমাজে একটা খুব উঁচু মর্যাদাও দেওয়া হয় নি এবং সে তার কেননা সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার অবকাশটুকুও পায়নি। অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, পরিচালনা করে, নির্দেশ দিয়ে, পরিকল্পনা করে—অন্যের কাজকর্মের ভার নিয়ে সে আপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসংশয় হয় ; অপরের উপর সর্দারি করতে না পারলে সে নিজেকে নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করে। সেক্ষেত্রে মানুষ নিজের কাজ নিজেই দেখতে

* রেমণ্ড অ্যারন, 'দি ওপিয়াম অব দি ইনটেলেকচুয়্যালস (গার্ডেন সিটি, এন ওয়াই : ডাবলডে, ১৯৫৭) P xiv

পারে এবং সমাজের কাজও নিজেরাই দেখাশোনা করে এবং অপরের খবরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ মোটেই পছন্দ করে না সেরকম ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী মনে করে যে সে অবহেলিত। বুদ্ধিজীবীর আপন মূল্য সম্বন্ধে যে সচেতনতা তা খর্ব হয় স্বাধীন সমাজে, ঠিক যেমন করে শ্রমজীবীর নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা খর্ব হয় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তনের ফলে। যে সমাজ-ব্যবস্থায় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কাজ চলে সেখানে বুদ্ধিজীবীরা অপাংক্তেয়।

বুদ্ধিজীবীরা এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা চায় যেখানে প্রতিনিয়তই অসাধারণ ব্যক্তিরা অসাধারণ কাজকর্ম করে থাকে। যে সমাজে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং পূজার আধিক্য সেই সমাজকে সে চায়; যে সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষরা পরিচালক ও যে ব্যবস্থার লক্ষ্য হোল যে এই সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী তাকে বলবে জৈব উদ্দেশ্যে পরিচালিত আত্মাহীন যন্ত্র বিশেষ। বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং বড় বড় কৃতবিদ্য মানুষদের কীর্তিকলাপের ফল যে ভোগ করবে সাধারণ মানুষ, এটা বুদ্ধিজীবীর কাছে বড়ই অসমীচীন মনে হয়।

* লিঙ্কন স্টিফেনস 'দি অটোবায়োগ্রাফি অব লিঙ্কন স্টিফেনস (নিউ ইয়র্ক হারকোর্ট ব্রেস, ১৯৩১), পৃঃ ৬৩৫

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মসিজীবী লেখক ও বিপ্লবী

একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে খ্রীষ্টের জন্মাবার তিন হাজার বছর আগে লিপিকলার উদ্ভাবনের সঙ্গে একটা নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল। কেননা এরদ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার এবং ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। আমরা পূর্বেই বলেছি যে লিপিকলার আবিষ্কারের পরে বহুশতাব্দী ধরে এটিকে হিসেব রাখার কাজে এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। খ্রীষ্টজন্মের হাজার বছর পূর্বে মানুষেরা প্রথম নিজেদের চিন্তা-ভাবনা মতামত লিখে রাখতে লাগলেন। তা সত্ত্বেও লিপিকলার উদ্ভাবনের ফলে এক গুরুত্বপূর্ণ আশু ফল ফললো; শিক্ষিত সমাজের উদ্ভব হোল। মসিজীবী যদিও কারুকার হিসেবে কাজ শুরু করেছিল কিন্তু গোড়া থেকেই তার যোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল তত্ত্বাবধায়কদের সঙ্গে, কর্মীদের সঙ্গে তার যোগ রইল না। মিশরের সমাধি-চিত্রে দেখা যায় বেত্রপাণি তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি দাঁড়ানো গোটানো কাগজ আর কলম হাতে মসিজীবী—উভয়েই এরা দাঁড়িয়ে আছে সাধারণ মেহনতি মানুষের মুখোমুখি। অতএব মসিজীবীর বৃত্তি অবলম্বন করে যে কোন সাধারণ মানুষ সমাজের সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয় মানুষের বলয় বৃত্তে প্রবেশ করতে পারতো; সুতরাং অন্যান্য কারুকলার এবং উপজীবিকার আশ্রয় না নিয়ে বহু প্রতিভাবান এবং উচ্চাভিলাষী মানুষ মসিজীবী হয়ে উঠল। অতএব এই ভাবে লিপি শিল্পের উদ্ভাবন সমাজের শক্তিকে একটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত করলো; এই পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কেননা এই ধরনের পরিবর্তন সাধারণতঃ ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ সূচিত করে।

লিপিশিল্পের আবিষ্কারের ফলে শিক্ষিত সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষেরা সমাজের ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে সহায় হোল। যখন শিক্ষিত মানুষেরা শাসকদের

সঙ্গে হাত মেলায় তখন সমাজে অশান্তি এবং বিপ্লবের সম্ভাবনা কমে যায়; কেননা শিক্ষিত মানুষেরাই সাধারণ মানুষদের অভাব-অভিযোগকে অসন্তোষ এবং বিদ্রোহে রূপায়িত করতে পারে যথাযোগ্য ভাষার মাধ্যমে। অন্যপক্ষে প্রাণবন্ত এবং বুদ্ধিমান শাসকের দলকে গদিচ্যুত করা সহজ হবে যদি তারা এই শিক্ষিত সমাজের আনুগত্যটুকু না পায়। যেখানে আমরা দীর্ঘস্থায়ী সমাজ-ব্যবস্থাকে কাজ করতে দেখেছি সেক্ষেত্রে হয় শিক্ষিত শ্রেণী অনুপস্থিত অথবা শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে শাসকদের একটা নিগূঢ় যোগ আছে, এর খুব বেশী ব্যতিক্রম নেই। এটা সত্যি হয়েছে সুমেরের মসিজীবীদের ক্ষেত্রে, মিশরের শিক্ষিত সমাজের পক্ষে এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে; চীনের মান্দারিনদের পক্ষে, ইহুদী ধর্মের রাব্বি ও পণ্ডিতদের পক্ষে, রোমক সাম্রাজ্যের রোমক এবং গ্রীক বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে বাইজান্তিয়ামে কুতই ও সেক্রেতইদের ক্ষেত্রে এবং ক্যাথলিক চার্চ ও ধর্মযাজকদের ক্ষেত্রেও এটি সত্য হয়েছে। চী এবং চূ নামক শাসকশ্রেণীদের সম্পর্কে চৈনিক ঋষি ম-শী বলেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের সাম্রাজ্য হারালেন এবং প্রাণটুকুও বিসর্জন দিলেন কেননা তাঁরা তাঁদের পণ্ডিতদের কাজে লাগান নি। দুর্ধর্ষ স্তালিন এই সত্যের প্রতিধ্বনি করে বললেন যে, কোন শাসক-শ্রেণী বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য ছাড়া স্থায়ী হতে পারে না।

শিক্ষিত সমাজের আনুগত্য পেতে হলে এবং তাকে জিইয়ে রাখতে হলে বুদ্ধিজীবীদের অভীষ্ট সাধক এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে; দীর্ঘস্থায়ী সমাজ এই সমস্যাটিকে সমাধান করেছেন শিক্ষিত সমাজটিকে শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে। মসিজীবী কিছু উৎপাদন করেন না বলে তাঁর পদমর্যাদা নির্ধারণ করতে হয়; তাঁর যে জীবনের ক্ষেত্রে উপযোগিতা রয়েছে এটি প্রমাণ করার জন্য সংসারের কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর যোগটুকু রক্ষা করা দরকার হয় এবং এমন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় যার দ্বারা তাঁর পদোন্নতি রুটিন মাফিক হতে পারে। বেসামরিক পদস্থ কর্মচারীর পদমর্যাদা তাঁকে দিলে এইসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়। আমলাতান্ত্রিক নিরাপদ প্রকোষ্ঠ থেকে মসিজীবী যখন জগৎকে দেখেন তখন তাঁদের জগৎটাকে ভালোই লাগে; তাঁদের কোন অভিযোগ থাকে না এবং তাঁরা কোন স্বপ্নও দেখেন না।

২

এই মসিজীবী লিপিকার ঠিক কি অবস্থায় লেখক হিসেবে আবির্ভূত হন ?

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লিপি শিল্পের আবিষ্কারের পরেও মসিজীবী সরকারী পদস্থ কর্মচারী হিসেবেই তাঁর লিপিকৌশলটুকু প্রয়োগ করেছিলেন ; তাঁর কাজ ছিল দলিল দস্তাবেজ রক্ষা করা, শ্রুতি লিখন করা, দলিলের এবং ধর্মগ্রন্থের প্রতিলিপি তৈরি করা। সাহিত্য ছিল কবি ও কথকদের জন্য সংরক্ষিত ক্ষেত্র ; অন্যান্য কারুশিল্পীদের মতোই তাঁরা তাঁদের ব্যবসায়ের গুপ্ত মন্ত্রটুকু কাউকে দিতে চাইতেন না। নিজেদের মানসিক ভাবসম্পদ লিপিবদ্ধ করার কথা তাঁরা ভাবতেন না।

কতিপয় প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে সাহিত্যের আবির্ভাবকালের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। খ্রীষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগে মিশরদেশে প্রথম আমরা সাহিত্য সৃষ্টির দেখা পাই ; এ হোল পুরানো সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার ফলে বিশৃঙ্খলাময় সেই কাল—সভ্যতার জন্মলাভের পরেই সেই প্রথম সামগ্রিক বিপর্যয়ের যুগ। খ্রীষ্টজন্মের দুই হাজার বছর আগে সুমেরে আমরা প্রাচীনতম সাহিত্য সৃষ্টি দেখেছি ; এই সময়টি সুমেরের সবচেয়ে গৌরবপূর্ণ অধ্যায় এবং এই সময়েই উরের তৃতীয় রাজবংশের পতন হয়। স্যার লিওনার্দ উলি মন্তব্য করেছিলেন যে উরের তৃতীয় রাজবংশের পতনের পরে আমরা তাঁদের কালের কোন সাহিত্যসৃষ্টির নজির খুঁজে পাই না। যখন এ্যামোরাইট এবং ইলামাইটদের আক্রমণের ফলে এঁদের সুবর্ণযুগের আকস্মিক ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটল তখন আমরা সাহিত্য সৃষ্টির কাজ প্রত্যক্ষ করলাম ; খ্রীষ্টের জন্মের দুহাজার বছর আগেকার কথা যখন "সুমেরীয় মসিজীবীরা এই গৌরবময় দিনগুলির কথা লিপিবদ্ধ করলেন।" * গ্রীসদেশে মাইসিনীয় যুগের আমলাতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসানের পরে প্রথম সাহিত্যকর্মের নজির

* সি লিওনার্দ উলি। দি সুমেরিয়ান্‌স (অক্সফোর্ড ; ক্ল্যারেনডন প্রেস, ১৯২৯) পৃঃ ১৭৮

পাওয়া গেল; প্যালেস্টাইনে রাজা সলোমনের কেন্দ্রগত শাসন-ব্যবস্থার সমাপ্তির পরে এটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সবশেষে খ্রীষ্টজন্মের ৬০০ বছর আগে চীনদেশে সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে; এই সময়ের চাউ সাম্রাজ্যের পতনের পরে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেই মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল।

সামাজিক বিপর্যয় এবং সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে যে পৌনঃপুনিক সম্বন্ধটুকু পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে একথা বলা যায় যে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য পৃথিবীতে আশু বিপর্যয়ের সম্ভাবনাটুকু বারবার সোচ্চার হয়ে ওঠার প্রয়োজন ছিল; তার ফলেই মসিজীবীর এই সৃষ্টিশক্তিটুকুর মুক্তি ঘটে। যদিও আমরা একথা ধরে নিই যে প্রতিষ্ঠিত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা যখন অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভেঙ্গে পড়ে, যখন হিংস্র কার্যকলাপ এবং অরাজকতায় দেশ ভবে ওঠে তবুও এ প্রশ্ন থেকে যায় যে কেবলমাত্র এই চিত্তচাঞ্চল্যকাবী বিশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থা সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট কিনা। মসিজীবীর চোখে ব্যক্তিগত ভাবে সমাজশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার একটা ব্যঞ্জনা আছে, সমাজের অন্য শ্রেণীর মানুষদের পক্ষেও এ ব্যঞ্জনা সত্য। অভিজাত এবং যাজকশ্রেণী এই সামাজিক বিপর্যয়কে কোন রকমে সহ্য করে; তাদেব প্রতিষ্ঠায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। প্রকৃতপক্ষে মিশরে ও চীনে যখন সাম্রাজ্যগুলি ভেঙ্গে পড়তে লাগলো তখন সেদেশে কতকগুলি সামন্ততান্ত্রিক রাজত্বের সৃষ্টি হোল; অভিজাত শ্রেণীদের শক্তি এবং মর্যাদা, যাজকশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা এর ফলে অক্ষুণ্ণ ত রইলই এমনকি বেড়েও গেল। মনিব বদল হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল তাঁবেদারিতে অভ্যস্ত জনগণের যে যে-অবস্থায় ছিল সেই একই অবস্থায় রয়ে গেল। কিন্তু মসিজীবীদের ক্ষেত্রে অন্য ব্যাপার ঘটল। তাঁরা তাঁদের আমলাতান্ত্রিক আশ্রয়ে পরম সুখে কাল কাটাচ্ছিলেন; তাঁদের মর্যাদা এবং উপযোগিতাটুকু সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করেনি; এখন তাঁরা হঠাৎ দেখলেন যে তাঁরা পরিত্যক্ত এবং তাঁদের কাজ গেছে। আমরা মসিজীবীর ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা পড়েছি মিশরীয় সাহিত্যের প্রাচীন দৃষ্টান্তসমূহের একটিতে; কোষাগারিক ইপুওয়ের লিখিত বিবরণীতে আমরা পাই :—"বিশৃঙ্খলার জন্য তাঁরা খাজনা দেয় না......প্রশাসকরা নিজেরা খেতে পান না; তাঁদের অনেক অভাব।... গোলাঘরে খাদ্যশস্য নেই এবং গোলাঘরের রক্ষক আজ মৃত। সুন্দর বিচার-কক্ষটি পরিত্যক্ত এবং এই কক্ষটি থেকে প্রাচীন পত্রগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া

হয়েছে, সাধারণের জন্য রক্ষিত প্রশাসনিক অফিসগুলি থেকে কাগজপত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে···। দেশের প্রশাসনিক কর্তারা অফিস থেকে বিচ্যুত হয়েছেন দেশে তাদের কোথাও স্থান নেই।" *

মসিজীবীর এই সরকারী পদমর্যাদা যখন বিলুপ্ত হোল তখন সে শুধু যে সন্ত, ভাববাদী এবং লোকশিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করলো তাই নয়, আপনার তুলিকলমের সহায়তায় পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সে ভীষণভাবে ব্যগ্র হয়ে উঠলো। এইভাবেই লিপিকুশল নেফরিন কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসলেন:— হে আমার হৃদয়, উত্তিষ্ঠত, যেন 'তোমরা যে দেশের মাটিতে জন্মেছ, সে দেশের জন্য বিলাপ করতে পার। বিশ্রাম করো না, পিছিয়ে পড়ো না···। তোমার চোখের সামনে সারা দেশটা পড়ে আছে...। গোটা দেশটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত 'হয়েছে, :কিছুই বাকী নেই।' † তাঁর সমকালীন ইপুওয়ের-এর মতোই তিনি খেদোক্তি করেছেন, আপনার দেশবাসীকে তিরস্কার করেছেন।

প্যালেস্টাইন এবং গ্রীসদেশে সরলীকৃত বর্ণমালার প্রবর্তনের ফলে আবার জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সামাজিক বিপ্লব একই সময়ে ঘটল। দেশে যখন কর্মসংস্থানের অবকাশ অল্প তখন এই শিক্ষিতের সংখ্যা বর্ধিত হওয়ার ফলে অশান্তি বেড়ে চলল। মেষপালক এমস কৃষিজীবী হিসিয়ড লিপিকৌশলটুকু আয়ত্ত করেছিলেন এবং তাঁদের স্বদেশবাসীকে এই কৌশলটুকু শেখাতে চেয়েছিলেন। এর জন্য তাঁরা এদের তিরস্কারও করেছিলেন।

চীন দেশে এই মসিজীবী পরিবারের অনেকেই সামাজিক বিপর্যয়ের সময়ে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল; তাঁদের মধ্যে তাঁরা লিপিকৌশলটুকু বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহামতি কনফুসিয়াস এই রকম একটি পরিবার থেকে এসেছিলেন। ‡ এই সব পরিবারের বংশধরেরাই পৃথিবীতে এসে সৃষ্টির উদ্বেলতাকে সার্থক করেছিল; অতীত গৌরবের স্মৃতি

* এডলফ এরম্যান, দি লিটারেচার অব দি অ্যানসিয়েন্ট ইজিপ্সিয়ান্‌স (লণ্ডন; মেথুয়েন অ্যাণ্ড কোং, ১৯১৭) পৃ. ৯৭-৯৯

† ঐ

‡ লিউ ওয়ু চি, কনফুসিয়াস, হিজ লাইফ অ্যাণ্ড টাইম (নিউইয়র্ক ফিলজফিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯৫৫), পৃ. ২৭

তাদের ধমনীতে আগুনের পবিত্র শিখার মতো জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল; তার ফলেই কাব্য, রোম্যান্স, দর্শন, ভাববাদ ও ভবিষ্যবাদের উদ্ভব হোল।

মসিজীবী যতদিন সরকারী কর্মে ব্যস্ত ছিল ততদিন সৃষ্টিধর্মী লেখায় হাত দেওয়ার অবকাশ তার অল্প ছিল। সৃষ্টির ইচ্ছাটুকু প্রায়শঃই উদ্ভূত হয় তখনই যখন কাজের মধ্য দিয়ে সে ইচ্ছা সার্থক হয় না। কর্মব্যস্ত অভীষ্ট সাধক সার্থক জীবনের প্রতি তার যে লিপ্সা তা অপূর্ণ থাকলে সৃষ্টিকর্মে এই অভিলাষ উৎসারিত হয়ে ওঠে। একবার লেখা আরম্ভ করে দিলে সে হাতের কাছে যা পায় তা নিয়েই লিখতে আরম্ভ করে: এমনি করে কাব্য, পুরাণ-কথা, রূপকথা, ইতিবৃত্ত, প্রবাদ এবং আরও অনেক কিছুর সৃষ্টি হোল। এবং এসকলের সংগ্রহও সংকলিত হল।

৩

এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে মসিজীবী মানুষ যে অবস্থায় লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করল সেই অবস্থায় সে খাঁটি বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হতে পারতো। তাঁর মতাদর্শ এবং পবিত্র লক্ষ্য যাই হোক না কেন এটা প্রায়ই সত্য হয় যে, আপন মনোমতো বৃহৎ এবং মহৎ কর্মে যিনি বিফল হয়েছেন তিনিই হচ্ছেন বিপ্লবী। বাকুনিন লিখেছিলেন যে প্রেমের পরেই কর্ম হোল মানুষের সর্বোত্তম সুখের আকর। কথায় এবং বাকবিতণ্ডায় হয়তো সে সারাজীবনই কাটিয়েছে কিন্তু সুযোগ এলে সে আপনাকে প্রথম শ্রেণীর কাজের লোক হিসাবে প্রকাশ করে।

প্যালেস্টাইনে এবং চীনে লেখক এবং বিপ্লবীর আবির্ভাব ঘটেছিল একই সঙ্গে এবং প্রায়শঃই একই ব্যক্তির মধ্যে এই উভয় সত্তা মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছিল। রেণাঁ বলেছেন যে, ভাববাদীরা হলেন প্রথম সাংবাদিকের দল; চীন মহাদেশে বেকার করনিকের দল একদিকে যেমন সাহিত্য-চর্চা করেছে অন্যদিকে আবার ধ্বংসাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করেছে; অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে যখন বিবাদ চলছিল তখন এই সব করণিকেরা সারা দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন অভিযোগ করা হয়েছে যে 'কনফুসিয়াস দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে একজন সামন্ত প্রভুকে আর একজন সামন্ত প্রভুর বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছিলেন; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করে

নেওয়া। *বিপ্লবীদের পূর্বপুরুষেরা যে মসিজীবী ছিলেন সেটা বোঝা যেত কেননা যখনই তারা ক্ষমতায় আসতো তখনই তারা এমন এক নিয়মাবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করতো যেখানে এই মসিজীবীদের প্রতিভার স্ফূরণ হতো এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতো; এই সমাজ-ব্যবস্থার খবরদারি করতো শিক্ষিত করণিকের দল।

তাদের একই বংশপরিচয় থাকা সত্বেও লেখকের এবং বিপ্লবীর শব্দের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনেক পার্থক্য থেকে গেছে। জাত লেখকের চোখে শব্দ হোল উপেয়, তার অস্তিত্বের মধ্যমণি। সে হয়তো একটা বৃহৎ কর্মের স্বপ্ন দেখে, সেই কর্ম সম্পাদনে সে হয়তো সক্রিয়ও হয়ে ওঠে, কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবনের ঘূর্ণিতে সে স্বস্তিবোধ করে না। তার কাজে যতই সার্থকতা আসুক না কেন এবং সে সার্থকতা যতই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, সে অন্তরে অন্তরে এটা অনুভব করে যে রুজিরোজগারের জন্য সে তার জন্মগত অধিকারকে বিকিয়ে দিচ্ছে। তার ভিতরে সৃষ্টিশক্তি যখন কথার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে তখন সে স্বস্তি পায়।

বিপ্লবীর কথা কিন্তু স্বতন্ত্র; তার কাছে কথাগুলি উপেয় নয় উপায় মাত্র; উপেয় হোল কর্ম। যে লক্ষ্যে সে পৌছাতে পারে নি তার দিকে তার সদা সতর্কদৃষ্টি; তার শক্তি সবসময় বাধাকে অতিক্রম করতে তৎপর। শুধুমাত্র কথার মারপ্যাঁচ করে সে তৃপ্তি বোধ করে না, যে জগতে কথা কাজে রূপান্তরিত হয় সেই দিকে তার গতি। কাজের মুখবন্ধ হিসাবে তার কাছে ভাব ও ভাবনার মূল্য। কাজের পথে যে বাধা রয়েছে তা দূর করবার পন্থা হিসেবে সে মতবাদ গড়ে তোলে, দর্শন-চর্চা করে এবং লেখার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

তাই বলছিলাম যে লেখক ও বিপ্লবীর মধ্যে একধরনের বিরোধিতা রয়েছে। সাধারণ ভাবে একথা বোধ হয় সত্যি যে লেখক যতখানি বিপ্লবী হয়েছে ঠিক ততখানি লেখকের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা বোধ হয় অন্তরশক্তির প্রশ্ন; খাঁটি লেখক তাঁর বিদ্রোহ লেখার মধ্য

* উল্‌ফ্র্যাম এবারহার্ড, 'এ হিসটরি অব চায়না (বার্কলি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্ণিয়া, ১৯৫০) পৃ, ৩৮

দিয়ে ঘোষণা করতে পারে, কিন্তু বিপ্লবী শুধুমাত্র বিদ্রোহ করতে পারে এবং তাই তার একটামাত্র উপজীব্য। এই বৈপ্লবিক শক্তি এবং লেখার শক্তি যখন একই লোকের মধ্যে দেখা যায়, সেই দুর্লভ যোগাযোগেও দুটি শক্তির একই সঙ্গে স্ফুরণ ঘটে না। মিলটন, ট্রটস্কি, কেস্টলার, সিলোঁ প্রমুখ লেখকগণ এবং অন্যান্যরা এমন এক সময় লেখা শুরু করলেন যখন নিষ্ক্রিয়তা স্বেচ্ছাকৃত নয়তো বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া। যখন নিষ্ক্রিয়তা তৎকালীন সমাজকে পেয়ে বসেছিল। ট্রটস্কি একথা জানতেন যে উত্তেজনার সময় এবং আবেগ-প্রবণতার যুগে সমাজে চিন্তা-ভাবনার বড় একটা অবকাশ থাকে না। বাগ্‌দেবীর সহচরীরা এমন কি সাংবাদিকতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীও বিপ্লবের সময়ে স্থবিরা হয়ে পড়েন। তিনি আরও বললেন, বিপ্লবীর পক্ষে লেখা যখন কাজের বিকল্প হয়ে দেখা দেয় তখন সে বিকল্প বড়ই দুর্বল। ট্রটস্কি তাঁর 'ডায়েরি ইন এগ্‌জাইল'এ লাসাল*সম্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি যা জানতেন তা লেখার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র হতেন না যদি বুঝতেন যে যা কারবার সামর্থ্য তাঁর আছে বলে তাঁর ধারণা ছিল তার কিছুটাও তিনি সম্পন্ন করতে পারতেন। এবং তিনি একথাও বলেছেন, যে-কোন বিপ্লবীরই অনুরূপ অনুভূতি হবে।

৪

যে সমাজে বেকার মসিজীবীরা পদমর্যাদাহীন এবং কাজের ধান্ধায় ঘুরে বেড়ায় সে সমাজে বিশৃঙ্খলা দীর্ঘস্থায়ী হয়। অশিক্ষিত সমাজে শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত বিপর্যয়পূর্ণ ঘটনা এবং ইতিহাসের গতিপথের পরিবর্তন এর ফলেই সম্ভবতঃ ঘটেছে। সম্ভবতঃ অনুন্নত দেশগুলির বিপর্যস্ত পরিস্থিতির সূত্রপাতের মূলে রয়েছে সমাজে শিক্ষার প্রসার। আমরা প্রায়ই শুনি যে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠল ; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তটি ছাড়া আমরা বোধ হয় অন্য কোনও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারবো না যেক্ষেত্রে দেশের জনগণই এই বিপ্লবের প্রধান হোতা এবং উৎসাহদাতা ছিল। পৃথিবীতে বর্তমানে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা নিশ্চয়ই জনগণের সৃষ্ট নয়।

* লাসাল ফের্‌ডিনান্ট—জার্মান সমাজতাত্ত্বিক এবং লেখক—অনুবাদক

অনুন্নত এবং উন্নত কোন দেশেই জনগণ অশান্ত, উগ্র এবং ছদ্ম অহংকারে স্ফীত নয়। সমকালীন নাট্যমঞ্চে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বর্তমান তার জন্য জনগণের দাবিদাওয়ার কোলাহল দায়ী নয়; স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসা স্নাতকদের দাবি-দাওয়াই এর জন্য দায়ী। এই মসিজীবীর দল এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা চাইছে যার পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ এবং দেখাশোনার ভার থাকবে এই শিক্ষিত মানুষদের উপর। এরা মসিজীবীদের জন্য স্বর্ণযুগ কামনা করছেন; প্রাচীন মিশর ও চীনে এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপের যে মসিজীবী-প্রভাবিত সমাজ-ব্যবস্থা ছিল তার অনুরূপ সমাজ-ব্যবস্থা এঁরা চান। নব অভ্যুত্থিত ও প্রগতিশীল দেশগুলিতে যে সামাজিক সমষ্টিকরণ পদ্ধতি অব্যাহত ভাবে চলছে তার মূলে রয়েছে এই মসজিবীদের জন্য যথাযথ কর্মসংস্থান করা। শিক্ষিতের হারের যতই বৃদ্ধি ঘটছে ততই আমলাতন্ত্রেরও প্রসার ঘটছে। একথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে উৎপাদনকারী শ্রমজীবী মানুষদের ও তত্ত্বধায়কদের মধ্যে অনুপাতের সমতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে আর্থিক অকার্যকরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেক্ষেত্রে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে সেক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষদের জন্য যথাযথ কর্মের সংস্থান করার অর্থই হোল অপচয় করা এবং সমাজের অকর্মণ্যতাকে পুষ্ট কবা।

এ কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, যে সমাজ-ব্যবস্থায় প্রতিভাধরকে কাজের সুযোগ দেয় সে সমাজ-ব্যবস্থা স্থায়ী হয়। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য অপদার্থ শক্তিহীন মানুষগুলোকে কাজ দিতে হয়। কেননা এই অকেজো মানুষগুলি সংখ্যায় অনেক, তারা তাদের অভাব-অভিযোগকে কোন সৃষ্টিকর্মে রূপায়িত করতে পারে না বলেই তাদের অসন্তোষ অনেক বেশী মুখর ও বিস্ফোরণ প্রবণ। তাই সমাজ-সংগঠকদের পক্ষে সবচেয়ে বড সমস্যা হোল কি করে এই অকেজো মানুষগুলোকে কাজে লাগানো যায় এবং কি করে তাদের আয়ত্তে রাখা যায়। এই অকর্মণ্য মানুষগুলোর মধ্যে এক ধরনের প্রবণতা রয়েছে যার ফলে তারা তাদের শক্তিটুকুকে নিজেদের উন্নতির চেষ্টায় নিযুক্ত না করে অপরের কাজে কর্মে, তাদের নিয়ন্ত্রণে ও তাদের অস্বার্থ প্রচেষ্টায় প্রযুক্ত করে। এরা চায় ওদের কাজে সর্দারি করতে, ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ওদের ব্যাপারে মাথা গলাতে। প্রাচুর্যপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থায় এই অতি সাধারণ মানুষগুলোকেও উন্নতি করবার সুযোগ দিতে হবে, তাদেরও

বুঝতে দিতে হবে যে তাদেরও সামাজিক উপযোগিতা আছে; অবশ্য শক্তিমান মানুষদের উন্নতি যেন এদের দ্বারা ব্যাহত না হয়, সেটাও দেখতে হবে। এটুকু করতে হলে তাদের আত্মোন্নতি এবং অভীষ্টসাধক কার্য সম্পাদনে প্রচুর অবকাশ সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, কারিগরি বিদ্যার এবং সামাজিক কর্মে পারদর্শিতার এমনভাবে প্রসার ঘটাতে হবে যার ফলে সাধারণ মানুষ বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই আপন আপন কাজটুকু করতে পারবে। মসিজীবীদের বিশেষ ধরনের প্রবণতাটুকু উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রয়োজনীয় কাজ-কর্মে যদি রূপায়িত করা যায় এবং সমগ্র জন সমাজে সাংস্কৃতিক মানটুকুর যদি উন্নতি ঘটানো যায় তাহলে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের বিভেদক সীমারেখাটুকু লুপ্ত হতে পাবে। এই ধবনের ব্যবস্থায় যদি প্রতিভাবানেরা উৎসাহিত বোধ না করেন তবুও একথা বলা চলে যে এই ব্যবস্থায় তাদরে কাজে কর্মে বাধা সৃষ্টি করা হয় না। একটি সমগ্র জনসমাজের অন্তর্নিহিত সৃষ্টি সম্ভাবনাটুকু সত্য করে তুলতে পারে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা খুব বেশী জানি না, কিন্তু আমবা এ কথা নিশ্চিতই জানি যে মসিজীবী প্রভাবিত সমাজে মানুষেব সৃষ্টিশক্তির পবিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ নেই।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

নীলাচঞ্চল মন

আমার এ কথা সব সময় মনে হয়েছে যে পৃথিবীর মানুষেরা তাদের মহৎ ব্যক্তিদের টুকরো টুকরো কথাগুলো সংরক্ষণ না করে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এঁদের কথাবার্তার অল্প অংশ যা আমরা পেয়েছি তার মধ্যে এক একটা অদ্ভুত ঋজুতা এবং তীক্ষ্ণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রত্যাশা করেছি, তাঁদের লেখায় এবং পোশাকী-আলাপ আলোচনায় সচরাচর যা পরিলক্ষিত হয় না। আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয় যে মানুষ এত সহজে অমৃতত্ব লাভ করতে পারে; এবং তাও লীলা এবং খেলার ছলে তাঁদের করায়ত্ত হল। একথা নিশ্চয়ই সত্যি যে কোনো কোনো লেখক যদি তাঁদের কথা বলার ঢঙে লিখতেন তাহলে তাঁরা অমর হয়ে থাকতেন, উদাহরণস্বরূপ ক্লে মাঁসোর নাম করতে পারি, তাঁর কেতাব গুলো দুরূহ এবং পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক, কিন্তু তিনি যখনই কিছু বলতেন তখনই তা মনে রাখবার মতো হতো। তাঁর টুকবো টুকরো কথাবার্তা মানবিক পরিস্থিতির উপর এমন আলোকপাত করতো যা আমরা সমাজতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব এবং ইতিহাসের ঝুড়ি ঝুড়ি কেতাবের মধ্যে খুঁজে পাইনা। জীবনের সায়াহ্নে এসে ক্লে মাঁসো বলে উঠেছিলেন বলে শোনা যায়:—"কি লজ্জার কথা যে আমি আর তিন চারটে বছর বাঁচতে পারবো না, যদি পারতাম তাহলে আমি আমার রাঁধুনীর জন্যে বইগুলি আবার নূতন করে লিখে যেতে পারতাম।" এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার নিউ টেস্টামেণ্ট এবং লুন ইউ গ্রন্থে অধিকাংশই উপস্থিতমতো কথাবার্তা মন্তব্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে, মন্‌টেন লিখে রাখতেন তিনি যা বলতেন। ("আমি আমার কাগজের সঙ্গে কথা বলি যেমন আমি কথা বলি সেই মানুষটির সঙ্গে যার প্রথম সাক্ষাৎ পাই।")

আমরা জানি একটি মহৎ জীবন হোল "পরিণত বয়সে যৌবনের চিন্তার পুর্ণগঠিত প্রতিচ্ছবি; একথাও হয়তো সমানভাবে সত্যি যে মহৎ চিন্তা হোল আমাদের লীলাচঞ্চল মুহূর্তের ভাব-ভাবনার ও ধ্যান-ধারণার একটা সংহত

রূপ। আর্কিমিডিসের স্নানঘরের বালতির গল্প এবং নিউটনের মাটিতে আপেল পড়ার গল্প থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে খুব গুরুত্বপুর্ণ চিন্তা অনেক সময় অলস চিন্তা থেকে উদ্ভুত। মানুষের মৌল অন্তর্দৃষ্টির সূত্রপাত হয় তখনই যখন মনের বিভিন্ন কক্ষে সঞ্চিত ভাবনার টুকরোগুলো সজ্ঞান চেতনায় যুথবদ্ধ হয়, পরস্পরের সঙ্গে যোগের ও বিয়োগের মাধ্যমে নব নব রূপ লাভ করে, যে মন একটি বিশেষ ধরনের ভাব ভাবনার দ্বারা অভিভূত সে মনে নতুন প্রশ্নের উদ্ভব হয় কি না সন্দেহ। এ কথা সত্যি যে ভাবনা এবং অন্তর্দৃষ্টির বিশ্লেষণ করতে হলে কঠিন পবিশ্রমসাধ্য চিন্তা-পদ্ধতির অনুসবণ করা দরকার; আরও যা প্রয়োজন তা হোল একাগ্র অভিনিবেশ। অনিশ্চয়তার অন্ধকার বিদীর্ণ করে যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মাধ্যমে নতুন আবিষ্কারের সন্ধান ঘটে তা কখনই বাইরে থেকে চাপ দিয়ে করা সম্ভব নয়।

মানুষ যখন জানে যে তাদেব চিন্তা ভাবনায় কোন গুরুত্বপূর্ণ ফল ফলবে না তখন তারা চিন্তা ভাবনা করতে চায় না। যখন আমাদের কাজের কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির প্রত্যাশা থাকে না তখন আমরা অনন্যপূর্ব পথে সন্ধানের চেষ্টা করি। তাই থেকেই এই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটেছে যে নানান আবিষ্কার সম্ভব হলো খেলা করতে করতে। পশ্চিম দেশে যন্ত্রের খেলনাগুলো থেকে কলকব্জার আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও প্রথমে খেলার সামগ্রী হিসাবে পরিকল্পিত হয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যতায়ই খেলনা তৈরীর কাজে আমরা এক অদ্ভুত নৈপুণ্য লক্ষ্য করেছি। অ্যাজটেকরা চক্রের ব্যবহার জানতেন না কিন্তু তাঁদের জন্তু জানোয়াবের খেলনাগুলোর পায়ের বদলে গোল গোল কাঠের রোলার লাগানো ছিল। সেকালের নিকট প্রাচ্যের চাকা এবং পালের ব্যবহার আমরা প্রথম দেখি খেলনাতে। একথা আমরা জানি যে, পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম কবরখানায় যে সব কঙ্কাল পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সে যুগের মানুষেরা ২৫ বছরের বেশী বাঁচতো না এবং একথা ভাবা ঠিক হবে না ঐ বিশেষ স্থানটি অস্বাস্থ্যকর ছিল। সুতরাং এমন সম্ভাবনা রয়ে গেছে যার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে নিওলিথিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল এবং এই সেদিন

পর্যন্ত এই সব আবিষ্কারই আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভিত্তিভূমি ছিল, এই সব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল শিশুসুলভ খেলাধূলার মধ্য দিয়ে। এটা খুব অসম্ভব নয় যে বাচ্চারা যে সব জন্তু জানোয়ার নিয়ে খেলা করতো তারাই আমাদের প্রথম গৃহপালিত প্রাণী। একথাও বোধ হয় সত্যি যে খেলতে খেলতেই মানুষ প্রথম আবিষ্কার করেছিল বৃক্ষরোপণ এবং জলসেচের পন্থাটুকু (পাঁচ বছরের একটি মেয়ে প্রথম আমাকে বলেছিল আমার টাকে কিছু কিছু চুলরোপণ করতে)। যদিও একথা প্রমাণ করা যায় যে জলহাওয়া বিশুষ্ককরণ, পশুপালন ও কৃষিকর্মের পুর্বগামী প্রাকৃতিক ঘটনা তবুও একথা বলা যাবে না যে জীবজন্তুকে পোষ মানানোর প্রবৃত্তি কোন এক বিশেষ ধরনের সঙ্কট থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সাধারণতঃ সঙ্কটকালে মানুষকে শক্তি এবং বুদ্ধি কর্ম এবং প্রযুক্তিতে আত্মনিয়োগ করে, পশুপাখীকে পোষমানানোর কাজটা আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল, অনেক পরে অবশ্য এদেব কাজে লাগানো হয়েছিল। মানুষেবা যা থেকে আনন্দ পেতো সংকট তাদের সেই সকল জিনিস ব্যবহারে প্রণোদিত করেছিল।

যখন আমরা দেখি যে পরিবেশের প্রতিদ্বন্দ্বে মানুষের সৃষ্টি শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে তখন এই সম্ভাবনটাই প্রবল হয় যে এই সৃষ্টিশীল মানুষেরা প্রতিকূল পরিবেশে কোনঠাসা হয়ে পড়েনি ; পরন্তু এই সব মানুষেরা তাদের শক্তির প্রাচুর্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বকে স্বাগত জানিয়েছে। যখন প্রয়োজনের চাপে পড়ে মানুষ কাজ করে তখন উঁচু ধরনের সৃষ্টিকর্ম সম্ভব হবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বাঁচার জন্য যে মর্মান্তিক লড়াই ; আমাদের উপর তার প্রভাব স্থাবর, সেই প্রভাব চিরগতিশীল নয়। জীবন ধারনের জন্য যার একান্ত প্রয়োজন তার জন্য অনুসন্ধান থেমে যায় যখন আমাদের জীবনে প্রাচুর্য আসে, কিন্তু অপ্রয়োজনের, অতিরিক্তের জন্য যে সন্ধান তার শেষ নেই। সুতরাং মানুষের অক্লান্ত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনটুকুর পিছনে ছোটে নি, তা ছুটেছে অতিরিক্তের পিছনে। একথা স্মরণ রাখবার মতো যে মানুষ যখন আদা, লঙ্কা, দারুচিনি এবং গোলমরিচের সন্ধান করছিল তখন তারা হঠাৎ আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করলো। প্রয়োজনের তাগিদে যে কাজ তা দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক হলেও তার মূল রয়ে গেছে অপ্রয়োজনের গভীরে। সমাধি মন্দির এবং প্রাসাদ আমাদের নিত্যব্যবহার্য

বাসগৃহের পূর্ববর্তী। পরিধেয় বস্ত্রের পূর্বেই অলঙ্কার ব্যবহার শুরু হয়েছিল, দল বেঁধে কাজ করার প্রেরণা এসেছিল খেলা থেকে। আমরা শুনেছি যে ধনুক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হবার আগে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল; এবং কনেক পণ্ডিত রয়েছেন যাঁরা মনে করেন যে মাছধরার কৌশলটুকু এমন এক সময় উদ্ভূত হয়েছিল যখন খেলাধূলার খুব প্রচলন ছিল; অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে এটা সম্ভব হয় নি, মানুষের কৌতুহল, কল্পনা এবং লীলাপরায়ণতা থেকেই এর উদ্ভব। আমরা জানি যে পদ্য এাসছিল গদ্যের আগে; হয়তো কথাবার্তা বলার আগেই মানুষ গান করতো।

তাহলে একথা সত্য হলেও হতে পারে যে ইতিহাসে যেগুলো সৃষ্টির যুগ বলে চিহ্নিত সে যুগের মানুষেরা লঘু হাস্যকৌতুকে; প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পেরিক্লীয় এথেন্সে, রেনেসাঁসের আমলে, এলিজাবেথীয় যুগে এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের এন্‌লাইটেনমেণ্ট রূপে খ্যাত পর্যায়ে আমরা মানুষের মধ্যে এই লঘু-চিত্ততার সাক্ষাৎ পেয়েছি। মিঃ নেহরু আমাদের বলেছেন যে ভারতবর্ষে "যখনই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে তখন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মানুষের জীবনে, তার প্রকৃতিতে, তার জীবনচর্যায় এক ঘনীভূত আনন্দের উদ্বেলতা।" আমাদের সন্দেহ হয় যে তারাই কেবল মুখ গোমড়া করে কাজ করার স্বপক্ষে ওকালতি করে যাদের গুরুত্ব এবং সম্মানের ছদ্মবেশের দরকার আছে। La Rochefouculd নিষ্ঠা সম্বন্ধে বলেছেন যে, "এটি হোল দেহাশ্রয়ী রহস্য মাত্র, মনের বিকারগুলো লুকিয়ে রাখার জন্য এর আবিষ্কার। এই গুরুতর নিষ্ঠার ব্যাপক প্রকাশ আমরা দেখেছি গণ-আন্দোলনে। গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ এবং স্বনিষ্ঠ উদ্দেশ্য এই গণ-আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে এবং এঁরা শুষ্ক পাণ্ডিত্যের বন্ধ্যা-ভূমিতে জন্ম নেয়, এই পণ্ডিতেরা লীলাময় সৃষ্টির ঘোরতর বিরোধী এবং এর প্রতি এঁদের মারাত্মক ঘৃণাও আছে। এই ধরনের আন্দোলনের ফলে ভয়, কৃচ্ছ্রতা, সংকীর্ণ মানসিকতা এবং বন্ধ্যাসমীকরণ জন্ম নেয়। গণ-আন্দোলনের কঠোর পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর কোন মহৎ সাহিত্য সঙ্গীত-শিল্প ও বিজ্ঞানের মনন ও সৃজন সম্ভবপর হয় নি। এই ধরনের আন্দোলন যখন অবসিতপ্রাণ, তাদের কৃচ্ছ্রসাধন এবং একঘেয়েমিতে যখন ফাটল ধরেছে তারা যখন তুচ্ছ আনন্দোচ্ছলতায় আবার মেতে উঠেছে তখনই

আবার দেখি শূন্যতা এবং ধূসরতার মধ্যে সৃষ্টির স্পন্দনটুকু ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে।

মানুষ স্তন্যপায়ী অন্যান্য উষ্ণরক্তবিশিষ্ট প্রাণীদের সঙ্গে, স্তন্যপায়ী-জীব এবং পাখীদের সঙ্গে তার এই ক্রীড়াপ্রবণতাটুকু ভাগ করে নিয়েছে; সরীসৃপ এবং পতঙ্গেরা খেলা করে না। এই যে প্রাণীজগতের মধ্যে দুটি দল—একদল খেলে আর একদল খেলা করে না এটি খুব অর্থপূর্ণ; আর এই যে খেলা করার প্রবৃত্তির একটা বাঁধাধরা বয়সকাল আছে এটাও সমধিক তাৎপর্যপূর্ণ। স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখীরা কম বয়সে খেলে, মানুষ কিন্তু জীবন-ভোরই খেলে। আমার মনে হয় যে বাল্যের এবং কৈশোরের ধর্মকে পরিণত বয়সে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতাই মানুষকে সারাজীবনের মতোই অপরিপক্ব এবং ছেলেমানুষ করে রাখে এবং এর মধ্যেই সারা বিশ্ব মানুষের অনন্যসাধারণ স্বকীয়তা, স্রষ্টা মানুষের মধ্যে এই স্বকীয়তা অতি প্রকট। যৌবনকে বলা হয়েছে অবক্ষয়ী প্রতিভা, কিন্তু আমার মনে হয় প্রতিভা এবং নব নব উন্মেষশালী শক্তি যৌবনেরই ধর্ম এবং সৃষ্টিশীল মানুষ হোল এই অনবক্ষয়ী কিশোর। যখন গ্রীক পণ্ডিতেরা বলতেন যে দেবতারা যাঁদের ভালবাসেন তাঁরা অল্প বয়সে মারা যান তখন বোধ হয় তাঁরা এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে ভগবান যাঁদের কৃপা করেন তাঁরা মৃত্যুকাল পর্যন্ত যুবকই থাকেন, তাঁবা খেলাও ভালোবাসেন; গ্রীস দেশের প্রবাদটির এই ব্যাখ্যাই লর্ড স্যাস্কিও দিয়েছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মনুষ্য প্রকৃতির প্রাকৃতত্ত্বই

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম যুগে আমরা এটা লক্ষ করেছি যে অনন্য সাধারণ বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির বৈচিত্র্যের অন্তরালে কতিপয় সরল বৈজ্ঞানিক সূত্রের আবিষ্কার করেছিলেন, এতে তাঁদের বিস্ময় এবং আনন্দের সীমা ছিল না। গ্যালিলিও প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে প্রকৃতি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে এমন সব পন্থায় যা একান্তভাবেই সরল, সহজ এবং সাধারণ, এটাই হোল প্রকৃতির রীতি এবং গতি। কেপলার এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে প্রকৃতি সরলতায় আস্থাবান ; এবং নিউটন খুব আবেগের সঙ্গে লিখেছেন যে, "প্রকৃতি সরল ক্রিয়াকর্মে আনন্দ পায় এবং খুব জমকালো ক্রিয়াকর্মের অনুকরণে তার প্রবৃত্তি নেই।"

ঐ একই সময়ে যারা মানবপ্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন তাঁরা কিন্তু এর সরলতার কথা বললেন না, বললেন এর অবিশ্বাস্য জটিলতার কথা। মানব প্রকৃতির অনিশ্চয়তা, অসমতা, অসংগতি ও ভবিতব্যতার অভাবের কথা মনটেন বারবার বললেন। তাঁর মতে আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশই প্রতি মুহূর্তে তাদের আপন আপন খেলা খেলছে, "আমাদের নিজেদের অন্তরের আভ্যন্তরীণ ভেদাভেদ অপরের সঙ্গে আমাদের যে প্রভেদ রয়েছে তার থেকে কিছু অংশে কম নয়।" বহিঃপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি এতদুভয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু প্যাসকেল বস্তুর সরলতার সঙ্গে মনুষ্য প্রকৃতির জটিলতার তুলনা করেছেন, তিনি মানুষের মধ্যে বহু পরস্পর-বিরোধিতার সমাবেশ দেখেছেন, দেবদূত এবং পশু, দানব এবং প্রতিভা, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রত্ন এবং আবর্জনা, বিশ্বের গৌরব এবং কুৎসা, এসবের সমন্বয়ে হোল মানুষ। আমাদের মধ্যে যেটুকু সমন্বয় রয়েছে তা উদ্ভট, তা পরিবর্তনশীল এবং তা বহুবিধ। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ এতখানি উন্মত্ত যে উন্মত্ত না হওয়াটাও এক ধরনের উন্মত্ততা। তাই যখন প্লেটো এবং

অ্যারিস্টটল রাজনীতি বিষয়ে লিখতে গিয়ে এমন ভাবে লিখলেন যে মনে হোল তাঁরা পাগলাগারদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করছেন তখন তাঁর মতে তাঁরা ঠিক কথাই বলেছেন।

প্রকৃতিতত্ত্ব আলোচনা করার সময় আমাদের এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সেই তত্ত্ব প্রকৃতির ঘটনাগুলির সঙ্গে সুসমঞ্জস হয় এবং তা যেন সরল ও ঋজু হয়। যেক্ষেত্রে নানান ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয় যে ব্যাখ্যা যতই সরল হয় ততই সঠিক হয়। বিজ্ঞানের প্রকৃতি বিষয়ে একজন আধুনিক লেখক বলেছেন যে জটিল ব্যাখ্যা করার অর্থ হোল আমার বাড়ীর পশ্চিমে যে নিকট প্রতিবেশীটি থাকে তার বাড়ী পৌছু-বার জন্য যদি আমি পুব দিক থেকে শুরু করে সারা পৃথিবী ঘুরে সেই প্রতি-বেশীটির বাড়ী যাই তাহলে যেমনটি হয় এই জটিল ব্যাখ্যা এর অনুরূপ হবে। মনুষ্য জগতে সরল ও ঋজু পদ্ধতির উপযোগিতা মোটে স্বতঃসিদ্ধ নয়। অতি সহজতম লক্ষ্যে পৌছুবার জন্য আমরা প্রায়ই খুব ভুলপথে এবং ঘুরপথে চলি। অভাবিত পথে সম্ভাবিত সিদ্ধিলাভ ঘটে। মানুষ যে উদ্ভট প্রাণী এটা ভুললে মানুষের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যকে ভোলা হবে, এবং মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে যখন আমরা চিন্তা করি তখন তার সম্বন্ধে আমরা যে কল্পনা এবং অনুমানই করি না কেন তা অযৌক্তিক এবং অবৈধ হয় না।

২

মানুষের নির্মাণকার্য যে সম্পূর্ণ হয় নি এটাই মানুষের সবচেয়ে অদ্ভুত গুণ, বিশেষ ধরনের ইন্দ্রিয়াদি নেই বলে মানুষ হোল এক অর্থে অর্ধপ্রাণী। কারিগরি বিদ্যার সহায়তায় সে আপনার ত্রুটিগুলি পূর্ণ করে এবং এই অর্থে সে স্রষ্টা,অর্ধ ঈশ্বর। একটি বিশেষ ধরনের পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়াদি মানুষের না থাকার ফলে মানুষ তার পরিবেশকে এবং পৃথিবীকে তার নিজের মতো করে পুনরায় সৃষ্টি করে নেয়। নিজেকে সম্পূর্ণ করার অন্তহীন প্রচেষ্টায়, আপনার দৈহিক অক্ষমতার পূরণের প্রয়াসের মধ্যে মানুষ আপনার সৃজনীশক্তির উৎসটুকু আবিষ্কার করে, এরা তার অপ্রাকৃত হবারও মূলে। নিজেকে সম্পূর্ণ করার এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির ধরাবাঁধা পথে যাওয়া এবং প্রকৃতির বশ্যতা পরিহার করে।

মনুষ্য-স্বভাবের অপ্রাকৃত চরিত্রটুকু হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের অগ্রগতির ব্যাখ্যা করতে পারবে বলে মনে হয়। প্রকৃতির লৌহবিধির আওতার বাইরে চলে আসবার প্রয়াসের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই চেষ্টাটুকু সজ্ঞান চেষ্টা নয়, আপনার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ফলে এর সূত্রপাত হয় নি। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার মূলে আছে একটা অসহায় ভাব, এই অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ফলেই মানুষের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এই মানুষরূপী অর্ধপ্রাণীটি ক্রমেই নিজের অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন হয়ে উঠল। জীবনের বিভিন্ন ধরনের উৎকৃষ্টতর প্রকাশ-রূপকে সে পূজা করলো, তাদের বিশেষ ধরনের ইন্দ্রিয়াদিকে পুজো করলো, তাদের কুশলতা এবং সামর্থ্যকে পুজো করলো। সম্ভবতঃ যে প্রথমে পশু হনন করেছিল সে তাদের মাংস খেয়েছিল এবং তাদের চর্ম পরিধান করেছিল, ক্ষুন্নিবৃত্তি করা এবং নিজেকে উষ্ণ রাখার জন্য যে মানুষ প্রথমে এই কাজ করেছিল তা নয়, কিন্তু তাদের শক্তি, গতি, সামর্থ্য আহরণ করে নিয়ে তাদের মতো হয়ে ওঠবার জন্যেই এটা করেছিল। নগ্ন, নিরস্ত্র এবং অরক্ষিত মানুষ উদাসীন জননী বসুন্ধরাকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং ধরিত্রীর অনুগ্রহপুষ্ট অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে চেয়েছিল, কিন্তু যখন সে আবিষ্কার করলো যে প্রকৃতির অনুগৃহীত এই সব সন্তানদের মতো তার ইন্দ্রিয়াদি এবং সহজাত শক্তি অতটা উঁচু ধরনের না হলেও এদের প্রতিকল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা তার আছে তখন মানুষ প্রকৃতির পুজো করা ছেড়ে প্রকৃতিকে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবার, জয় করবার নেশায় মেতে উঠলো। মানুষ আপনাকে পূর্ণ করে তুলে নিজের পরিবেশটিকেও ধীরে ধীরে গড়ে তোলে এবং মানুষের সৃষ্টি এই জগৎ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। জীবনের অন্যান্য রূপের অভিব্যক্তির সঙ্গে আত্মীয়তার দাবি না করে মানুষ আপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র এবং বংশপরম্পরা বংশপর্যায় দাবি করলো এবং সৃষ্টির অংশ থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং মর্যাদা বাঁচিয়ে রেখে নিজেকে পৃথক বলে ভাবতে লাগলো।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চেষ্টার স্বকীয়তা অথবা তার কৃতির গৌরব পরিমাপ করতে হলে আমাদের দেখতে হবে যে মানবিক জগতের কাজকর্মের সঙ্গে অমানবিক জগতের প্রভেদটুকু এর দ্বারা কতটুকু উজ্জীবিত হচ্ছে।

এটা অতি পরিষ্কার কথা যে স্বাধীনতার জন্ম অভীপ্সা মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের মধ্যে প্রধানতম। বলপ্রয়োগ থেকে মুক্তি, অভাব ও ভয় থেকে মুক্তি, মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি এসবই হোল সেই সব পারিপার্শ্বিক শক্তির হাত থেকে মুক্তি যারা বৃহত্তর প্রকৃতি থেকে মনুষ্য প্রকৃতির ব্যবধানটুকু কমিয়ে দেয় এবং মানুষের উপরে জড় প্রকৃতির নিষ্ক্রিয়তা ও পূর্বনির্দিষ্ট কর্ম-প্রবণতাটুকু চাপিয়ে দেয়। এই একই নিরিখের বিচারে একথা বলা যায় যে মানুষের অদ্বিতীয়তার পরিপন্থী হোল মানুষের সার্বভৌম শক্তি। এই ধরনের সার্বভৌমশক্তির অন্তরে যে দুর্নীতির প্রবণতা রয়েছে তার মূলে হোল এই সত্যটুকু যে শক্তি মানুষকে বস্তুতে পরিণত করে এবং মানুষ যে প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত সেই প্রকৃতির মধ্যেই আবার তাকে টেনে নিয়ে যায়। কেননা শক্তির ধর্মই হোল যে যা পরিবর্তনশীল তাকে অপরিবর্তনীয় করে তোলা এবং আপন আপন আদেশকে প্রকৃতির আদেশের অনমীয়তা এবং অপরিবর্তনতাটুকু দান করা। অতএব মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও সার্বভৌম শক্তির ক্রমেই অবনতি ঘটে। সে সব উদরেনৈতিক স্বৈরাচারী শাসকেরা নিজেদের মেষপালকের মতো মনে করেন তাঁরাই অপরের কাছ থেকে মেষেদের যোগ্য বাধ্যতাটুকু দাবি করেন। সার্বভৌম শক্তির অন্তরে খুব যে অমানুষিকতা আছে তা নয় তবে মনুষ্য-বিরোধিতাটুকু তার মধ্যে রয়ে গেছে।

৩

মানুষের জগৎকে সুসংগত, সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্ধারিত সামগ্রিক সত্তারূপে গ্রহণ করতে হলে মানুষের নিজস্ব স্বভাবটুকুকে হয় উপেক্ষা করতে হবে নয় তাকে সম্পূর্ণ ভাবে দমন করতে হবে এবং মনুষ্য প্রকৃতিকে বৃহত্তর প্রকৃতির অংশ হিসাব গ্রহণ করতে হবে। তাত্ত্বিকেরা অমানবিক শক্তির হাতে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতাটুকু তুলে দিয়ে এটুকু সম্পন্ন করে: বিশ্ব-বিধাতা, ভৌগোলিক সংস্থান, জলবায়ু, আর্থনীতিক অথবা নৈসর্গিক রাসায়নিক শক্তি সমূহে। শক্তিমান কাজের মানুষেরা লৌহশৃঙ্খলা এবং অন্ধ বিশ্বাসের প্রবর্তন করে মানুষের স্বাধীনতাটুকু হরণ করতে চেয়েছে; সে ব্যক্তি-মানুষ

সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে কোন কিছু বলা যেত না তার সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যটুকু লুপ্ত করে দিয়ে, তার বিচার এবং স্বাধীন ইচ্ছাকে বল প্রয়োগ এবং অভ্রান্ত প্রচারের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দিয়ে তারা ব্যক্তিসত্তার বিনাশ করলো। মানুষের স্বকীয়তাটুকু নষ্ট করে দিয়ে ইতিহাসের জনকেরা নির্ভুলভাবে ভবিষ্যৎটুকু বলে দিতে পারতেন এবং ইতিহাসবেত্তারা অতীত সম্বন্ধে একটি বাঁধাধরা ছক দিতে পারতেন। নির্ধারণবাদীদের মধ্যে এক ধরনের দুষ্টবুদ্ধি রয়ে গেছে ; তারা সবাই মনে করে যে মানুষ বড়ই উপদ্রব করে এবং সেই একই সঙ্গে তারা প্রমাণের চেষ্টা করে সে মনুষ্য প্রকৃতির মতো উৎকৃষ্ট বস্তু আর নেই।

যে সমাজে স্বাধীনতার অপ্রতুল নেই সেখানেও মানুষকে অতি সংক্ষিপ্ত সুনির্দিষ্ট যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে ; ক্ষমতাসীন মানুষদের কাজ কর্ম বিচারের সময় আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে তারা সজ্ঞানে অথবা অচেতন-ভাবে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যটুকু নষ্ট করে দেবার জন্য চেষ্টা করছে তা সে মানুষ ভোটদাতাই হোক, শ্রমিকই, মালিকই হোক অথবা চিন্তাজীবীই হোক। তারা যে উপায়ই প্রয়োগ করুন না কেন তাঁদের উদ্দেশ্য হোল মানুষকে ক্রিয়াশীল একটি যন্ত্রে পরিণত করা, অ্যারিষ্টটলের সংজ্ঞায় এদের ক্রীতদাস বলা হয়েছে।

অন্যপক্ষের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পুষ্ট করে তোলার জন্য সব পন্থাই সার্বভৌম শক্তির পরিপন্থী। লক্ষণ দেখে যা বোঝা যাচ্ছে তা হোল যে এই বিনষ্ট ব্যক্তি-মানুষের শক্তিবৃদ্ধি করে অথবা শক্তিমানদের বিরুদ্ধে তাকে উস্কে দিয়ে এটি করা যাবে না, কিন্তু শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ করে একদলকে অন্যদলের বিরুদ্ধে খাড়া করে দিয়ে এটি সম্ভব করা যাবে। যে ক্ষেত্রে শক্তি সার্বভৌমরূপ পরিগ্রহ করেছে সেক্ষেত্রে পরাজিত ব্যক্তি-মানুষ কোন আশ্রয়ই পায় না তা সে যতই কৌশলী এবং শক্তিমান হোক।

এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে প্রচলিত সব রকমের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মুক্ত সমাজই হোল সবচেয়ে আস্বাভাবিক। বের্গস-এর ভাষায় এই ধরনের সমাজে আমরা যে ধরনের প্রচেষ্টা দেখি তা হোল প্রকৃতির ধর্মের পরিপন্থী। কারিগরী বিদ্যার আধুনিকী-করণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চললেও সার্বিকতাবাদ মানুষকে আদিম প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়ে

নিয়ে যায়। রুশোর দিন থেকে আরম্ভ করে আমরা যে "প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যাও" এই আন্দোলনটি প্রত্যক্ষ করেছি তা অসংশয়িত ভাবে স্বৈরতন্ত্র এবং পশুশক্তির পুজায় পর্যবসিত হয়েছে ; এই ধরনের আন্দোলনকে অনেকে উদারনৈতিক এবং মহান বলে মনে করেছেন। মানুষের চরিত্রের জটিলতা এবং অনিশ্চিত পরিণতির কথা ভেবে মনে হয় যে মনুষ্যচরিত্রের সম্যক জ্ঞানলাভ করলেও বোধ হয় তাদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সমাজযন্ত্র বোধ হয় ভালোভাবেই চলবে যদি আমরা একনায়কতন্ত্রের প্রবর্তন করি, (একনায়কতন্ত্রে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ধর্তব্যের মধ্যেই মনে করে না) অথবা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে যখন সরকার ব্যক্তির কাজে কোনভাবে হস্তক্ষেপ করে না সার্বভৌম একনায়কতন্ত্র অথবা নামমাত্র সরকার, এরা উভয়েই মানুষের স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে।

৪

আমরা জড় বস্তুর উপরেই হোক আর মানুষের উপরই হোক যে শক্তির প্রয়োগ করি তাকে সহজেই সরলীকৃত করে ফেলা যায়। এই শক্তি চায় সহজ সমস্যা, সহজ সমাধান ও সহজ সংজ্ঞা। জটিলতার মধ্যেই দুর্বলতা বাস করে—আপসের পথ হোল জটিল।

জড় বস্তুর জগতে যেমন বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগ বিদ্যাবিদেরা সরলীকরণের উপরে ঝোঁক দিয়েছেন তেমনি মনুষ্যসমাজের ব্যাপারে যারা এই সরলীকরণটুকু এনেছেন তাঁরা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করেছেন। হিটলার ও স্তালিনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যে অর্থে পদার্থতত্ত্ববিদ ও রসায়নশাস্ত্রবিদ হলেন জড় পদার্থের বিজ্ঞানী, কতকটা সেই অর্থে হিটলার ও স্তালিন হলেন মনুষ্যপ্রকৃতির বিজ্ঞানী। তাঁদের ভ্রষ্ট নীতি এবং দুষ্কর্মের পিছনে বিজ্ঞানীর সরলীকরণ প্রবণতাটুকু পূর্বনির্দিষ্টতা ও পরিমাণ প্রবনতাটুকু যেমন ছিল তেমনি ছিল নিজের দলীয় তত্ত্ব ও নিছক দুষ্কার্যপ্রিয়তা। তাঁদের বিরুদ্ধে মতবাদীদের সম্বন্ধে মারাত্মক অসহিষ্ণুতার ভিতরেও একটা বৈজ্ঞানিক চেতনার সন্ধান পাই ; যে সার্বভৌমশক্তির বিরুদ্ধতা করে সে হোল প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যতিক্রমের অনুরূপ ;

উভয়কেই বিচার বিশ্লেষণ করে কোন রকমে তাদের লোপ পাইয়ে দিতে হবে।

এটা একটা নিছক গোঁজামিলের ব্যাপার নয়, যখন আমরা দেখি যে সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বশক্তিমান কর্তারা পাভ্‌লফের* কুকুর নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্বন্ধে খুব আগ্রহশীল হয়ে উঠেছেন ; এই পরীক্ষা নিরীক্ষার সামাজিক তাৎপর্য অনেক ; জার্মানীর এবং কমিউনিস্ট দেশগুলিতে যে সব বন্দী শিবির খোলা হয়েছিল সেগুলো অমানুষ করে তোলার কারখানাবিশেষ, সেখানে মানুষদের জন্তু হিসাবে গণ্য করা হতো ; সেভাবে বিজ্ঞানীরা ইঁদুর এবং কুকুর নিয়ে গবেষণা করে এরা সেখানে মানুষ নিয়ে সেইভাবে গবেষণা করতো। সার্বভৌমশক্তি কোন সমাজের প্রতিষ্ঠা করে না, তা পশুশালার পত্তন করে ; হয়তো D' Argeonson-এর ভাষায় একে "সুখী মানুষের পশুশালাও" বলা যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে আমরা যে চরম দুঃসাহসিক কাজটুকু প্রত্যক্ষ করেছি তা হোল মানুষকে খুব ছোট করে ভাবার দুঃসাহিসকতা, এ অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থার সূচনা করেছিল। তা ছিল অভাবিতপূর্ব এবং তাঁরাও অতর্কিত ভাবে পৃথিবীটাকে আক্রমণ করেছিল এবং অভিভূতও করে ফেলেছিল।

শক্তির আস্বাদন তখনই পূর্ণ হয় যখন আমরা প্রকৃতিকে আয়ত্ত না করে মানুষকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করি। যে মানুষ পাহাড় পর্বত সরিয়ে দিতে পারে এবং নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে সে মানুষের শক্তিমত্তাবোধ আর যে মানুষ জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তাদের প্রাণবন্ত যন্ত্রে পরিণত করতে পারে তার মদমত্ততার বোধ একইরকম কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অতএব এটা বোঝা যাচ্ছে যে প্রকৃতির উপর মানুষের চমকপ্রদ আধিপত্যের পরেই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটা চেষ্টা হয়েছিল। প্রকৃতিকে জয় করে যে শক্তি অর্জিত হয়েছিল সেই শক্তি মানুষকে দাসত্ববন্ধনে বাঁধবার কাজে অবারিত হল। নিউলিথিক যুগের শেষ থেকে প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতার সমষ্টিতান্ত্রিক

---

* পাভ্‌লফ (১৮৪৯-১৯৩৬)—রুশ শারীর বৃত্তবিৎ ও চিকিৎসক।

—অনুবাদক

সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তরে এই প্রভেদটি প্রথম চোখে পড়ে। আমরা পুর্বেই বলেছি যে নিকটপ্রাচ্যে নিওলিথিক যুগের শেষে এক ধরনের শিল্পবিপ্লব লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তার পরবর্তীযুগে যে সভ্যতার যুগ প্রবর্তিত হোল তা যাদুবিদ্যা এবং বল প্রয়োগের দ্বারা ব্যক্তিমানুষকে বশ করতে চাইলো।

আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প-বিপ্লব প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পথে পরবর্তী বৃহৎ পদক্ষেপ ; প্রকৃতিকে বশ করে মানুষ যে প্রভূত শক্তি অর্জন করলো তার অনুগামীরূপে দেখা দিল মানুষ বশ করার উন্মাদ প্রয়াস ; তারা চাইল মানুষকে প্রকৃতির জড় বস্তুর পর্যায়ে নামিয়ে দিতে। যেক্ষেত্রে প্রকৃতিকে বশ করার দুরূহ প্রচেষ্টায় আমরা প্রকৃতিকে ক্রীতদাস করে ফেলতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে পরিপুর্ণ বশীকরণের এটা হোল একটা ছল মাত্র। সুতরাং যদিও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যায় বিংশ শতাব্দীতে আমাদের বহু চমকপ্রদ কীর্তিস্তম্ভ রচিত হয়েছে তবুও যখন আমরা পিছু ফিরে তাকাবো তখন মনে হবে যে বিংশ শতাব্দী হোল মানুষকে বশ করার, মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তারের যুগ—জাতীয়তা, সমাজতন্ত্রবাদ, কমিউনিজম, ফ্যাসীবাদ, জঙ্গীবাদ, সমিতি গঠন, প্রচার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সব মতবাদ ও প্রচেষ্টার এক উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যটুকু হোল নানাভাবে তদ্বির তদারক করে মানুষের স্ববশচিত্ততাটুকু হরণ করা। এক্ষেত্রেও আবহাওয়া বলপ্রয়োগ এবং যাদু-শক্তির প্রয়োগে ভারাক্রান্ত।

প্রাচীন ইহুদিদের এটা একটা খুব বড় কৃতিত্বের কথা যে তাঁরাই প্রথমে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনেছিলেন। সব প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই এইরকম একটা ধারণা দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে মানুষের জীবন একই সূত্রে গাঁথা। ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের গোটা বনিয়াদ মনুষ্য প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির প্রকাত্মতার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহুদিরাই প্রথম মনুষ্য জগৎ ও মনুষ্যেতর জগতের মধ্যে কোন আত্মিক যোগকে অস্বীকার করলেন। তাঁদের সময় থেকে সূর্য্য, তারকা, আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, নদী, গাছপালা ও জীবজন্তুর মধ্যে এমন কোন রহস্যময় শক্তিই আরোপ করা হোল

না যে শক্তি মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। সবকিছুই একই ভগবানের সৃষ্টি; তিনি প্রকৃতি এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন আপনার প্রতিরূপ করে। মানুষ হয়েছিল দ্বিতীয় স্রষ্টা। ইহুদিদের কাল থেকে বিশ্বজগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ বেশী প্রাধান্য পেল, কেননা সেখানেই পৃথিবীর অর্থপূর্ণ নাটকটি অভিনীত হচ্ছে।

প্রথমে এই প্রাচীন ইহুদিরা প্রমান করলেন সে মানুষদের পক্ষে যোগ্যতমের উদ্বর্তন তত্ত্বটি গ্রাহ্য নয়, যদিও প্রাণী জগতের সর্বত্র এই যোগ্যতমের উদ্বর্তন তত্ত্বটি প্রযোজ্য তবু তা মনুষ্য সমাজে নয়। তাঁরা এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বললেন যা দুর্বলতাকে সবলের শক্তি সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করে এক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। একধরনের গোঁড়ামি, দূরাশ্রিত আশা এবং সীমাহীন ভক্তি এগুলি তাঁরা আপন অন্তরে প্রতিষ্ঠা করেছিলো। এগুলির দৌলতে দুর্বল শুধুমাত্র যে বেঁচেই থাকে তা নয়, সবলকে তাঁরা সময়ে সময়ে হতবুদ্ধিও করে দেয়।

সর্বোপরি মনুষ্যপ্রকৃতির অপ্রাকৃততা দুর্বল মানুষের মধ্যে যে পরিমাণে লক্ষ্যণীয় ঠিক সেই পরিমাণে সবলের মধ্যে লক্ষণীয় নয়। শক্তিমান মানুষেরা সাধারণতঃ সহজ, সরল, ঋজু এবং বোধগম্য হয়; একথায় তারা প্রকৃতি-অনুসারী এমন কথা বলার পক্ষে যুক্তি রয়েছে যে দুর্বল মানুষেরাই সর্বপ্রথমে প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। সবল মানুষদের দ্বারা বন থেকে বিতাড়িত হয়ে তারাই প্রথমে সোজা হয়ে হাঁটবার চেষ্টা করেছিল; তাদের ক্ষুব্ধ আবেগ প্রথম বাক্যে রূপ নিতে চেষ্টা করেছিল; তারাই প্রথম লাঠি কুড়িয়ে নিয়েছিল তা যন্ত্র এবং অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। তাদের যে শক্তি নেই সেই শক্তির বিকল্পের আবিষ্কার করার জন্য এই দুর্বল মানুষদের প্রভূত উদ্ভাবনী শক্তি ছিল; এর দ্বারা এটাই বোঝা যাচ্ছে যে প্রযুক্তি বিদ্যার উদ্বর্তনে এদের ভূমিকা ছিল প্রধান।

মানুষকে আমরা তার মানবিকরূপে প্রত্যক্ষ করি যখন সে তার অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারে না। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর পথে যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রয়েছে সেই বাধার সম্মুখীন হলে যে আবেগ সঞ্জাত হয় তার ফলেই মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন সম্ভবপর হয়, সোজা সহজ পথে পা ফেলে এগিয়ে গেলে মানুষের

কোন সাফল্য অর্জিত হবে না। মানুষের অগ্নিগর্ভবাণী এবং বিস্ফোরক বিকল্পগুলি এই পরিপ্রেক্ষিতেই উদ্ভূত হয় এবং তার অন্তহীন যাত্রা, তার আত্মার গগনচুম্বী প্রসার তাও সম্ভব হয়।

এই গ্রহে মানুষের অনুপযুক্ততা, জাতিচ্যুত ও বহিরঙ্গ হওয়ার ফলে দাঁড়ায় তোলা কইমাছের মতো। তার অবস্থা তাকে নতুন নতুন পথে দুঃসাহসিক অভিযানে প্রেরণা দিয়েছিল, তাই এটা মোটেই অসংগত নয় যে অজানার সঙ্গে লড়াইয়ে পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই অনুপযুক্ত ও বহিরঙ্গ মানুষের দল। অসম পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে মানুষের মধ্যে পেছিয়ে না গিয়ে ঝাপিয়ে পড়বার একটা প্রবণতা দেখা যায়। অধিকন্তু মনুষ্যচরিত্রের স্বকীয়তার সঙ্গে সংগতি রেখে এই অযোগ্য মানুষেরাই তাদের পারিপার্শ্বিকে পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে আপনাদের বাসযোগ্য করে গড়ে তোলে। অতএব সংস্কার, আবিষ্কার, মেরামত করা এবং ঝাপিয়ে পড়া এসবের জন্যেই একটা প্রবণতা তাদের আছে। তাই নতুন নতুন মহাদেশে অভিযাত্রীদলের পুরোভাগে এই তথাকথিত অযোগ্য লোকেদের আমরা দেখেছি। তারাই আর্থনীতিক রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন পথ এবং পদ্ধতির প্রবর্তন করে।

এটা মনুষ্য সমাজের পক্ষে খুব গর্বের কথা যে তাদের মধ্যে যারা পরিত্যক্ত তারা পথিপার্শ্বে পড়ে থাকে না; নতুন সমাজ-ব্যবস্থার তারাই হোল ভিত্তি প্রস্তর; যারা বর্তমানের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারলো না তারা ভবিষ্যৎ রচনায় অংশীদার হয়ে ওঠে। ডি এইচ লরেন্স-এর মতো পণ্ডিতেরা যাঁরা মনে করেন যে এই দুর্বল মানুষদের সংস্পর্শে সভ্যতার অবনতি ঘটে তাঁরা ঠিক সত্যটি ধরতে পারেন নি। সমাজের এই দুর্বল অংশের ভূমিকাই মনুষ্য সমাজকে তার বৈশিষ্ট্যটুকু দিয়েছে। মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে এই দুর্বল মানুষদের আধিপত্য নৈসর্গিক পন্থার বিকল্পপন্থা সূচিত করছে। মানুষের স্বাভাবিক এবং সহজাত প্রবৃত্তির কোন বিকার এর দ্বারা সূচিত হচ্ছে না; এদের আনুকূল্যে নতুন সৃষ্টি সম্ভাবনার পথ খুলে যাচ্ছে।

দুর্বল মানুষেরা মহাত্মা নন। তাঁদের বিশ্বাস, দুঃসাহস এবং আত্মত্যাগজাত মহৎ কর্ম সাধারণতঃ খুব সন্দেহজনক অনুপ্রেরণা থেকে উদ্ভূত হয়। দুর্বল মানুষেরা দুষ্টামির চেয়েও দুর্বলতাকে ঘৃণা করে, তারা যে দুর্বলতাকে ঘৃণা করে

তার প্রমাণ হোল তারা নিজেদেরই ঘৃণা করে। দুর্বল মানুষদের যে সাগ্রহ পলায়নটুকু আমরা দেখেছি তা হোল নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার প্রয়াস। তার এই প্রচেষ্টার মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, আত্মপ্রবণতা এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র স্বার্থ লুকিয়ে আছে; তবুও এসবের মধ্য দিয়েও সে বড়ো একটা কিছু করতে পারে। তাই আমরা দেখি যে যারা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যর্থ হোল তারা অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করে। তারা বড় বড় পরিকল্পনা নেয়; অনন্যসাধারণ একাগ্রতা, দুর্মদ শক্তি এবং কর্ম সম্পাদনে এমন এক বিশেষ ধরনের নৈপুণ্য তাদের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই যা হয়তো অনেক শ্রেষ্ঠতর মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। এটা খুব অদ্ভুত শোনায় যে সম্ভাব্যের হাতে যারা পরাজিত হয় তারাই অসম্ভবের সাধনা করে; কিন্তু দুর্বলের মানসিকতার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে দুঃসাহসের পথই হোল সহজ পথ। দুর্বল মানুষেরা বিফলমনোরথ হবার বেদনাটুকু এড়ানোর জন্য বড বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কেননা যা সহজ এবং সম্ভাব্য তা করতে না পারলে লোকে আমাদের দোষ দেয়; কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করতে না পারলে সেই বিফলতার দায়িত্ব কাজের গুরুত্বের উপর আরোপিত হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নতুনকে আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে দুর্বল এবং অশক্ত প্রকৃতির মানুষেরা একধরনের দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে থাকেন। যাঁরা জীবনে সফল হয়েছেন তাঁরা আমূল সামাজিক সংস্কার চান না, ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পে সম্পূর্ণ অভিনবত্বকে বরণ করেন না, বন-বাদাড়'কেটে বসতি স্থাপন করতে যান না অথবা সাহিত্য, শিল্প এবং সংগীতে নতুন প্রকাশ ধারারও প্রবর্তন করেন না। যাঁরা ভালো কাজকর্ম করছেন তাঁরা স্বস্থান থেকে আরও ভালো কাজ করার চেষ্টা করেন কেননা তাঁরা যেটুকু জানেন সেটুকু আরও ভালোভাবে করার চেষ্টা করেন। যে পরিস্থিতি ভারসাম্য হারিয়েছে তা থেকে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টাই হোল নতুনকে সাগ্রহে বরণ করা; এর দ্বারা নিজের অক্ষমতা ঢাকা পড়ে। অগ্রদূত এবং অগ্রচারীর ভূমিকা গ্রহণ করার অর্থই হোল এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যেখানে অসামর্থ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য গ্রহণযোগ্য এবং অপরিত্যাজ্য অভিজ্ঞতা এবং কোনো কিছু করার জ্ঞান এবং নৈপুণ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নতুনকে বশ করা যায় না; অতএব যা অভিনব তা কুৎসিত এবং কিম্ভূতকিমাকার।

সন্দেহজনক প্ররোচনা এবং মহৎ কর্ম সম্পাদনের মধ্যে যে অসংগতি আছে তা দেখিয়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে আমরা মানবদেবতাকে নিন্দা করছি; পরন্তু আমরা তার প্রশংসা করছি। যেহেতু মানুষের সৃষ্টি শক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল অতি সাধারণ এবং তুচ্ছ প্রবণতাকে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি দান করা। রাসায়নিকের ধাতুর পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণাটুকু প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মিথ্যা বলে মনে হয়, কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতির বাস্তবতার সঙ্গে তা মেলে। মানুষের অন্তরাত্মায় ভালো এবং মন্দের ভারসাম্যটুকু রক্ষিত হয়; উচ্চ ও নীচ, মহৎ ও হাস্যকর, সুন্দর ও কুৎসিত, গুরুত্বপূর্ণ এবং তুচ্ছ সবার মধ্যেই এ ভারসাম্যটুকু বজায় থাকে। সাফল্যের উৎকর্ষ এবং কর্মের উদ্দেশ্য এ দুই-এর মধ্যেই নিকট সম্বন্ধের কল্পনা করলে আমরা মনুষ্য চরিত্রের স্বকীয়তার প্রতি অন্ধ হয়ে থাকব। মানুষ হিসেবে আমাদের মহত্ত্ব হোল সেখানেই যখন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব অভিযোগ, আনন্দ বেদনা ও দৈনন্দিন প্রয়োজন এবং ক্ষুধা এসব কিছু নিয়ে যে কাজটুকু আমরা করতে পারবো তা যথাযথ সম্পন্ন করি। কীট্‌স লিখেছিলেন যে আমরা যখন কোন ব্যাপারে সামান্য বিব্রত বোধ করি তখন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই বোধটুকু এমনভাবে গুরুতর আকার ধারণ করে যে তা সোফোক্লিসের নাটকের উপজীব্য হয়ে পড়ে। সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে সাধারণের অভিজ্ঞতার সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে আছে। সব ঘটনাই নতুন নতুন ভাব ভাবনা এবং অন্তর্দৃষ্টি থেকে সমান দূরে; তার সীমাহীন মানবতাবোধের স্ফূরণ আমরা দেখি মানুষের তুচ্ছ এবং অতি সাধারণকে অসাধারণ করে দেখাবার শক্তির মধ্যে।

৬

যে বিষয়টি এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার মতো তা হোল মানুষের স্বকীয়তার গভীরে যে সব গুণগুলি রয়েছে তারাই মানুষের সৃষ্টি শক্তির উজ্জীবন ঘটায়। আমরা আগেই দেখেছি যে মানুষের অসম্পূর্ণতা, সে যে অসম্পূর্ণ প্রাণী এই বোধটুকু তাকে তার অনন্যসাধারণ জীবনচর্যায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এই অসম্পূর্ণতাটুকু আমরা দেখি মানুষের বিশেষ ধরনের ইন্দ্রিয়ের অভাবের মধ্যে এবং এই ইন্দ্রিয়গত অভাবটুকু পরিপূরণ করার চেষ্টার অভাবের

মধ্যে ; মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অসম্পূর্ণতা এবং ধীরে ধীরে বড় হয়ে পরিণত হওয়ার অক্ষমতাটুকুও এই অসম্পূর্ণতার মধ্যে পড়ে। এই যে ত্রুটিগুলির কথা বললাম এরা সকলেই মানুষের সৃষ্টিশক্তিকে উৎসারিত করে দেবার ব্যাপারে বড় বড় ভূমিকা নিয়েছে। মানুষের বিশেষ ধরনের ইন্দ্রিয় না থাকার ফলে মানুষ অস্ত্র এবং হাতিয়ার খুঁজতে লাগলো, সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণায় স্বয়ংক্রিয় না হতে পেরে মানুষের ব্যবহারে দ্বিধা দেখা দিল। জীবজন্তুদের মধ্যে অনুভূতির পরেই ঘটে কাজের সূত্রপাত। রাসায়নিক দ্রুততা এবং নিশ্চয়তার সঙ্গে যান্ত্রিকভাবে কর্মও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মানুষের বেলায় ঠিক পথেব সন্ধানটুকু করা যায় না, ভুল এবং বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে না গিয়ে। এই বিরতির মধ্য দিয়েই আমরা পাই রূপকল্প, ভাব-ভাবনা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য, বিরক্তি, অভিলাষ এবং সৃষ্টিকর্মের প্রারম্ভিক সূত্রগুলি। সবশেষে পরিণত বয়সে যৌবনোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি যদি রক্ষা করা যায় তাহলে বোধহয় মানুষের শক্তির প্রকাশ ঘটে লীলার মাধ্যমে ; অন্তর্দৃষ্টি এবং আলোকিত সন্ধানের পক্ষে তা গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা এটুকু প্রত্যাশা করতে পারি যে স্ববশ ব্যক্তির মধ্যে এই অসম্পূর্ণতাটুকু যেন সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। ব্যক্তিমানুষ যখন স্বনির্ভর হয় তখন তার মতো অসম্পূর্ণ জীব বড় একটা দেখা যায় না ; তার অসম্পূর্ণতা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ এবং নিত্যস্থায়ী। অপরের সঙ্গে যুক্ত এবং যুথবদ্ধ যে ব্যক্তিমানুষ তার অনন্য-সাধারণতাটুকু বহুলাংশে অস্পষ্ট। অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ার অর্থ হোল পূর্ণ হয়ে ওঠা এবং ভারসাম্যটুকু আপনাআপনি রক্ষিত হওয়া। দৃঢ়সম্বদ্ধ সমষ্টি জীবন এক ধরনের আনুগত্য, পূর্বনির্দিষ্টতা এবং স্বয়ংক্রিয়তার জনক যা আমাদের অমানবিক্ প্রকৃতির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তাই যুথভ্রষ্ট মানুষের আবির্ভাব মানুষের স্বকীয়তা অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তথাপি একথা বলা যায় যে এই পদক্ষেপটি কোনও ধীরমন্থর সামাজিক অগ্রগতির পরিণতি নয়, বরং বিপর্যয় এবং প্রলয়ংকর অবস্থার ফলস্বরূপ। প্রথম ব্যক্তি মানুষটি হোক্ জাতিচ্যুত শরণার্থী, সে নিঃসঙ্গ এবং একক। এই নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বকে মানুষ সাগ্রহে চায়নি, কিন্তু একে তারা দুর্ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিল ঃ সে যুথভ্রষ্ট হয়েছিল। ইতিহাসের সৃষ্টির স্বর্ণযুগগুলির পূর্বেই সর্বত্র সমাজ-জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ব্যক্তিমানুষের ধ্বংসস্তূপ থেকেই সৃষ্টিকর্মের

সূচনা। যা কিছু নতুন তারই মূলে ছিল এই পলাতক আশ্রয়প্রার্থী। তারাই প্রথম স্বাধীন মানুষ, তারাই প্রথম নগর এবং সভ্যতার পত্তন করেছিল; তারাই দুঃসাহসিক আবিষ্কারের সম্মান পেল; ইজরায়েল, গ্রীস, রোম এবং আমেরিকার বীজ হোল তারাই।

যূথবদ্ধ জীবন থেকে ব্যক্তিমানুষকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে তার বেদনা থেকে সে কখনই মুক্তি পায় না। নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব সর্বদাই অসম্পূর্ণ এবং ভারসাম্যহীন। তার সৃষ্টিপ্রচেষ্টা এবং আবেগচালিত প্রয়াসের মূলে রয়েছে ঐ পূর্ণতা এবং ভার-সাম্যটুকু ফিরে পাবার জন্য অন্ধ আকুতি। ঐ ব্যক্তিমানুষ যখন নিজেকে ফিরে পেতে চায়, নিজের মূল্যটুকু সপ্রমাণ করতে চায় তখনই সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তি বিদ্যায় মহৎ কিছু সৃষ্টি সম্ভব হয়। ব্যক্তিমানুষ যখন নিজেকে ফিরে পায় না অথবা নিজের অস্তিত্বটুকুর মূল্য যাচাই করতে পারে না আপন চেষ্টায়, তখন তার মধ্যে অপরিসীম ব্যর্থতা বাসা বাঁধে, অশান্তির সূত্রপাত হয় তার মধ্যে যা কালক্রমে আমাদের ভিতকেও কাঁপিয়ে দেয়। ব্যক্তিমানুষের জীবনের ভারটুকু বহন না করার প্রবণতা থেকেই এইসব অশান্তির সূত্রপাত; এই অশান্তির পরিণতি ঘটে সমষ্টিতান্ত্রিক সংস্থায় যারা সার্বভৌম শক্তিতে বিশ্বাস করে।

এটা একটা অদ্ভুত দৃশ্য: মানুষ তার স্বকীয়তার বোঝা বহনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে বোঝাটুকু এ কাঁধ থেকে ও কাঁধে নিয়ে শেষে তাকে ফেলে দেয়। কেননা যখন সে পিছনে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় তখন নিজেকে এক বিরাট জনতার মধ্যে দেখে যে জনতা পতাকা উড়াচ্ছে, বাদ্য বাজাচ্ছে এবং অপরিসীম আনুগত্য এবং নিশ্চয়তার দিকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে; তারা পিছিয়ে যাচ্ছে বহুদিনের একটি প্রাচীন পর্বতমালার নুড়ি হবার জন্য, একটি সামগ্রিক কাঠামোর অখ্যাত একটি অংশরূপে গণ্য হবার জন্য।

তত্রাচ মনুষ্য-প্রকৃতির একটি অদ্ভুত গুণ হোল এই যে এই সাগ্রহ পশ্চাদপ-সরণ মূলতঃ আর কিছুই নয়, সামনে এগিয়ে যাবার জন্য শুধু এক পা পেছিয়ে যাওয়া। আধুনিক পশ্চিম জগতে ক্রমাগত লড়াই চলছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং *স্বাতন্ত্র্যবিরোধী প্রবণতার মধ্যে। রেনেসাঁস আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে* রিফরমেশন-এর যে স্থান, এন্‌লাইটেনমেণ্ট-এর যুগের সঙ্গে জ্যাকবিনিজম্‌-এর যে সম্পর্ক ঠিক সেই সম্পর্ক রয়েছে উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে

বিংশ শতাব্দীর উৎকট স্বাদেশিকতা এবং সমাজতান্ত্রিক সংঘক্রিয়াবাদের (collectivism) আজ পর্যন্ত পশ্চিমের মানুষের উদ্ভাবনক্ষমতা তাকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী আন্দোলন যে আবেগকে উৎসারিত করে দিয়েছে সে তাকে নিজের সৃষ্টিমূলক কাজে লাগিয়েছে; আত্মোন্নতির জন্য তাকে ব্যবহার করেছে। তাই আমরা গত চারশো বছরের ইতিহাসে বারংবার প্রত্যক্ষ করেছি কিভাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বিরোধী আন্দোলনের পরবর্তী যুগে ব্যক্তি-মানুষেরা সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে; সাহিত্যে এবং শিল্পে তারা কিভাবে দুঃসাহসী সৃষ্টির জোয়ার এনে দিয়েছে। সমকালীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বিরোধী আন্দোলনে আমরা যে অভূতপূর্ব রূঢ়তা প্রত্যক্ষ করেছি তা আমাদের ভাবিত করে তুলেছে, ব্যক্তি-মানুষ এর পরে কি আবার শীর্ষস্থান অধিকার করবে? অনেকেই একথা ভাবছেন যে, এই ভীতিপ্রদ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সমকালীন গণআন্দোলন কি পশ্চিম দেশের ব্যক্তিমানুষকে চিরতরে গোষ্ঠীর আধিপত্য স্বীকার করাবে?

৭

মানুষের স্বভাবকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বোঝার চেষ্টা করলে মানুষের জগতে কথার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে পুরোপুরি বোঝা যায় না। কথার শব্দমূল্য অথবা চিত্রমূল্য আমাদের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, গতিবেগ বৃদ্ধি করে অথবা মন্থর করে দেয় সেই জটিল প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা দুরূহ, কেননা সাধারণতঃ কথাগুলো অর্থহীন হয়ে থাকে।

এটা খুবই আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করার মতো যে প্রকৃতির ক্ষেত্রে ম্যাজিকের ব্যবহার—কথা দিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস—এ সবই এই মৌল বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল যে প্রকৃতি মনুষ্যপ্রকৃতি থেকে ভিন্ন নয়; এটি আরও ধরে নেওয়া হয় যে মানুষের জগতে যে সব পদ্ধতি কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে তা মনুষ্যেতর জগতেও প্রয়োগ করলে কার্যকরী হবে। মানুষের প্রকৃতি বৃহত্তর প্রকৃতির অংশমাত্র—এই বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের

প্রতিচ্ছবি হোল উপরোক্ত প্রত্যয়টুকু। উপরোক্ত প্রত্যয়টুকু এই বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় থেকে বেশী অযৌক্তিক নয়।

আমরা জানি যে কথা দিয়ে পাহাড় টলানো যায় না কিন্তু তা দিয়ে জনগণকে চালানো যায়; অন্য কিছুর চেয়েও কেবলমাত্র কথার জন্য মানুষেরা যুদ্ধ করে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। কথা চিন্তাকে রূপ দেয়, আবেগকে উদ্বেলিত করে এবং কর্মের সূত্রপাত করে; কথাই মানুষকে হত্যা করে এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত করে; তার অধঃপতনের জন্য কথাই দায়ী এবং কথাই তার ব্যাধি নিরাময় করে। আমরা যাদের কথার মানুষ বলি সেই সব পুরোহিত ভাববাদী ও বুদ্ধিজীবীরা জঙ্গীনেতা, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও ব্যবসাদারদের চেয়েও ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

সংকটকালে যখন মানুষের পুরানো জীবনের প্রথাগুলো ভেঙে পড়ছে এবং মানুষ অজ্ঞাত অভিনবের সঙ্গে লড়াই করছে তখন কথার এবং ম্যাজিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য এবং উদ্দীপনা তাদের কার্যকরী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে; গদ্যময় বাস্তবের জন্য মানুষ অজানার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যকে পাবার জন্য তার আত্মার প্রসার ঘটাতে হবে। তার দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপকে সুস্থ এবং সুদৃঢ় করার জন্য রূপকথার পরীদের গল্প, ইন্দ্রজালের ছোঁয়ার প্রয়োজন হয়। বাস্তবের অনুসরণ জ্ঞানের বিকিরণ এ-দুটোর কোনোটাই গোড়ায় আধুনিক বিজ্ঞানের এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উপজীব্য হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রেও রাসায়নিক ভবিষ্যদ্বক্তা এবং ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা প্রমুখ ঐন্দ্রজালিকেরাই হলেন পথিকৃৎ। প্রথম যুগের রাসায়নিকেরা দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন না কিন্তু তাঁরা পরশ পাথর এবং অমৃতের সন্ধান করেছিলেন। প্রাচীন জ্যোতির্বেত্তা এবং আবিষ্কারকেরা পুরাণ কথা এবং পরীর গল্প থেকে প্রেরণা পেতেন। কলাম্বাস শুধুমাত্র সোনা এবং সোনায় মোড়া সাম্রাজ্যের সন্ধান করেন নি; তিনি স্বর্গোদ্যানের সন্ধান করেছিলেন। যখন তিনি অরিনকো নদীর দেখা পেলেন তখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে ইডেন উদ্যানের চারিটি নদীর অন্যতম গিহন নদীর দেখা তিনি পেয়েছেন। তিনি স্পেন দেশে পত্রযোগে জানিয়েছিলেন যে তিনি যেসব নিদর্শন এবং প্রমাণ এতদস্থলে প্রত্যক্ষ করেছেন তা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করছেন যে এই অঞ্চলেই স্বর্গরাজ্যের দেখা

পাওয়া যাবে। গাণিতিক সমীক্ষাও তাঁর এই সিদ্ধান্তকে নাকি সমর্থন করেছিল।

কথা এবং ইন্দ্রজালের ভূমিকা যে কতখানি গুরুত্বপুর্ণ আকার নিতে পারে ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে সে সম্বন্ধে একটা সচেতনতা না থাকলে আমরা হয়তো ইতিহাসের মর্মার্থটুকু উদ্ঘাটন করতে পারবো না। আমরা যে শতাব্দীতে বাস করি সেই শতকে লোক বৈজ্ঞানিক চেতনা ও উৎকৃষ্ট বাস্তব বোধের দ্বারা প্রভাবিত। জাত্যভিমানী ফ্যাসীবাদ ও কমিউনিজম ও উৎকট স্বাদেশিকতার ইন্দ্রজালও এই যুগকে প্রভাবিত করেছে। লক্ষ লক্ষ চাষীকে শহুরে শিল্পশ্রমিকের দ্রুত রূপান্তরকরণের অর্থ হোল নিওলিথিক যুগ থেকে বিংশ-শতাব্দীর তোরণদ্বারে প্রবেশ করা, আসন্ন জাতীয়, গোষ্ঠীগত অথবা সামাজিক স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে হৃদয়দ্রাবী রূপকথা এবং মরীচিকার অবতারণা না করলে বোধ হয় এই নূতন যুগে উত্তরণ সম্ভব হয় না।

বর্তমানকালে একটা বিশ্বাস ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে যে মানবজাতি একটা যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। পারমাণবিক সর্বাত্মক ধ্বংসের ভয় থেকে এই বিশ্বাস আংশিক ভাবে জন্ম নিয়েছে; এবং অংশত জন্ম নিয়েছে আমাদের এই ভয় থেকে যে যদি কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে দীর্ঘদিন স্থায়ী যুদ্ধ বাধে তাহলে যে সমষ্টিতন্ত্রকে আমরা ঘৃণা করি সেই সমষ্টিতন্ত্রের আদর্শেই আমাদেব সমাজ গঠিত হবে, যে আশায় বুক বেঁধে আমরা এদের সঙ্গে লড়াই করবো প্রকৃতপক্ষে আমরা সেই আশাকেই হনন করে ফেলব। আরও দুর্লক্ষণ হোল এই যে, জাতির মধ্যে যে মানুষেরা দুর্বল, যারা এতদিন পথপ্রদর্শকরূপে এবং ভবিষ্যতের নিয়ন্তারূপে কাজ করেছে তাদের আমরা হয়তো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো। বিজ্ঞানে এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় যে নতুন বিপ্লব ঘটে গেল, যা প্রকৃতির উপরে মানুষের ক্ষমতাকে প্রভূতভাবে বাড়িয়ে দিল তাও সাধারণ মানুষের মূল্য অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলে এবং পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের ফলে হয়তো শীঘ্রই মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ সারা দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে পারবে এবং জনগণের সাহায্য ছাড়াই যুদ্ধবিগ্রহেরও নিষ্পত্তি করে দিবে। অদ্ভুতভাবে জটিল এবং ব্যয়সাধ্য পরীক্ষাগারে বর্তমানে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে; আদর্শ মানবেরা এই

সব পরীক্ষাগারে কাজ করেন। মানুষের শক্তি বিস্তারের এই নতুন দিগন্তে অকেজো এবং পরিত্যক্ত মানুষদের কোন স্থান নেই। দুর্বলকে আজকে আর ইতিহাসের গতির নিয়ন্তা এবং আন্দোলনের প্রেরণা দাতারূপে দেখা হচ্ছে না; আবর্জনার মতোই তাকে পরিত্যাগ করার সম্ভাবনাটুকুই প্রকট হয়ে উঠছে। যখন দুর্বল মানুষকে ইতিহাসের নিয়ন্তারূপে আমরা দেখব না তখন ইতিহাস এবং প্রাণীবিদ্যায় (Zoology) বিশেষ কোন পার্থক্য থাকবে না বলে অনেকে ভয় পাচ্ছেন, সে ভয় খুব অমূলক নয়।

বর্তমান সংকটের ফলে আমাদের মধ্যে যে শ্রান্তি এবং নৈরাশ্য এসেছে তার পরিণতি হিসাবে আমাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির স্বচ্ছতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। সে সব শক্তি দুর্বল মানুষদের বৃহত্তর অন্ধকারের জগতে নিক্ষেপ করছে আমরা যখন সেই সব শক্তির পরিমাপ করছি তখন পৃথিবীর সর্বত্রই এমন সব ঘটনা ঘটছে যা দেখে আমরা স্তব্ধ হয়ে থামছি, বিস্মিত হচ্ছি এবং আশা করছি। ঠিক এই মুহূর্তেই আমরা অনুন্নত দেশগুলির সর্বত্র দেখছি জ্ঞানে, পার্থিব সম্পদে এবং পারদর্শিতায় নূতন মানুষেরা যুগযুগসঞ্চিত নিষ্ক্রিয়তা থেকে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সদর্পে প্রবেশ করেই এক অবিস্মরণীয় নাটকের অভিনয় করছে, এ নাটকটির উপজীব্য হোল সবচেয়ে পশ্চাদবর্তী মানুষের সর্বাগ্রগামী হওয়ার অভিনয়। এই অভিনয়ের গুরুত্ব অনেক; এবং যদি আমরা এর মর্মার্থটুকু সম্যক অবগত হই তাহলে এর স্থূলতা, উগ্রতা, পাশবিকতা, শত্রুতা এবং অভিনেতাদের অত্যুৎসাহ আমাদের পীড়া দেবে না। আমরা এটুকুই আশা করব যে এটাই তাদের শেষ অভিনয় হবে না।

যদি আমরা মনুষ্য-চরিত্রের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হই তাহলে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিতে যা ঘটছে তার মর্মোদ্ধার করা আমাদের পক্ষে শক্ত হবে। একটি অনুন্নত দেশকে আধুনিকীকরণের যে কাজ তা হোল ধীর স্থির কাজের লোকেদের দায়িত্ব, সেটুকু করতে গিয়ে একটা পাগলাগারদের অভিনয় করার দরকার কি? উপায় এবং উপেয়ের মধ্যে যে অভূতপূর্ব বৈষম্য মানুষের কাজকর্মে দেখা যায় তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা এক্ষেত্রে পাই। রূপকথা, অদ্ভুত ইন্দ্রজাল এবং বশীকরণ প্রভৃতির সহায়তায়, দুর্বল মানুষদের শক্তির উজ্জীবন ঘটানোর দরকার হয়, বাধা-

বিপত্তি এড়িয়ে তারা আপন আপন পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা পায়। যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অথবা আপন স্বার্থের দোহাই দিয়ে অনুন্নত দেশগুলির অশিক্ষিত এবং সমৃদ্ধিহীন জনগণকে পুরোপুরি কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। তাদের শেখাতে এবং পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেও সম্মত করা শক্ত হয়ে পড়ে। কেননা শিক্ষাকে তারা তাঁদের অসম্পূর্ণতার প্রমাণ হিসাবে দেখে, এবং ধীর অগ্রগতিকে তারা বর্তমানের পঙ্ককুণ্ডের উপরে আপন ভারসাম্য রক্ষার জন্য হাত পা ছোঁড়ার শামিল বলে মনে করে। তারা গতানুগতিক ধীর পদক্ষেপ চায় না, অধঃপতিত বর্তমান থেকে গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে একটা অতি বিস্ময়কর লম্ফপ্রদান তারা কামনা করে। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাটুকুর প্রয়োজন হয় যে যখন তাদের ভবিষ্যতের প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে অন্য মানুষদের অতীতের কীর্তিকে ধরার চেষ্টা করছে মাত্র তখন তারা বোঝাতে চায় যে তারা পৃথিবীতে সকলের অগ্রগামী এবং মনুষ্যসমাজকে তারা পথ দেখাচ্ছে। দেশের শিল্প গড়ে তোলার ব্যবহারিক প্রয়োজনটুকু তাদের চোখে একটি পবিত্র উদ্দেশ্যের বেদীতে একটি মহৎ কর্মসম্পাদনরূপে প্রতিভাত হওয়া চাই। শক্তি ব্যঞ্জক কথা স্ব-ধর্মীদের সঙ্গে নিত্যযোগ এবং উদ্ধত তাচ্ছিল্যের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন রয়েছে কারিগরী শিক্ষার, প্রচুর কলকব্জার এবং সন্তোষজনক খাদ্যব্যবস্থা এবং আশ্রয়-স্থলের। ইতিহাসের সমুন্নত চূড়োয় অনুন্নত মানুষেরা উঠতে চায়; তারা সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের মনুষ্য-সমাজের অগ্রচারী বলে ভাবতে চায়, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্যের তারা ধারক ও বাহক হতে চায়; তারা নিজেদের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের নির্বাচিত যন্ত্র বলে মনে করে। তাদের অনুন্নত অবস্থা থেকে এই যে নিষ্ক্রমণ এটাকে বিজয়ীর অভিযান বলে গণ্য করতে চায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অবাঞ্ছিতদের ভূমিকা

১৯৩৪ সালের শীতকালে ক্যালিফোর্নিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল গভর্নমেণ্ট ব্যবস্থিত একটি অস্থায়ী ক্যাম্পে আমি কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম। দেশে যখন কাজকর্মে মন্দা পড়েছিল তখন গভর্নর রল্‌ফ এই ধরনের ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গৃহ-হীন, অবিবাহিত মানুষদের আশ্রয় দেবার জন্য। ১৯৩৪ সালে কিছু সময়ের জন্য ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট এই ক্যাম্পগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং তখনই আমি এই ক্যাম্পগুলোর কথা জানতে পারি।

আমি কি করে এই ধরনের একটি ক্যাম্পে আশ্রয় পেয়েছিলাম সে কথা বলছি। ক্যালিফোর্নিয়ার হাজার হাজার কৃষি-শ্রমিকের মতোই আমি তখন দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে ফসল তোলার কাজ করছিলাম। ১৯৩৪ সালের গোড়ার দিকে আমি এল সেণ্ট্রো শহরে উপস্থিত হই, শহরটি হোল ইম্পীরিয়্যাল ভ্যালিতে। স্যান ডিয়েগো থেকে মুফতে একটা ট্রাকে চড়ে এল সেণ্ট্রোতে এলাম, ড্রাইভার যখন আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল শহরের উপান্তে তখন মধ্যরাত্রি। রাস্তার ধারে আমি বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। সবে আমার তন্দ্রা এসেছে এমন সময়ে একজন পুলিশ-কর্মচারী মোটর সাইকেলে চড়ে এসে আমার পাশে থামল এবং আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "বন্ধু, বিছানা গুটিয়ে নাও।" মনে হোল এবার আমার একটা কিছু হবে; এটা প্রায়ই ঘটত যে পুলিশ অত্যুৎসাহী হয়ে মালবাহী গাড়ী ঘেরাও করে মানুষদের ধরে ধরে নামাতো। কিন্তু মনে হোল পুলিশটির এই ধরনের কোন সদুদ্দেশ্য নেই। সে বলল, "তুমি বরং কেন্দ্রীয় আশ্রয় স্থলে গিয়ে আশ্রয় নাও, সেখানে তুমি বিছানা পাবে এবং চাই কি প্রাতরাশও পেতে পার।" সে আমাকে পথের নির্দেশও দিয়ে দিল।

আমি গিয়ে একটা হল-ঘরের সামনে দাঁড়ালাম; এটা বোধ হয় কোন পুরানো মোটর গ্যারাজ, আলোগুলো মিটিমিটি জ্বলছে, এবং অসংখ্য চৌকিতে

ঘর ভর্তি। থমথমে বাতাস কেঁপে উঠছিল বহুজনের ভারী নিশ্বাসের ঐক-তানে। দরজার কাছে একটি ছোট্ট অফিসে একটি মধ্যবয়সী কেরানী আমার নামধাম লিখে নিলেন। তিনি আমাকে বললেন যে এই আশ্রয়ে আমি এক-রাত্রি থাকতে পারবো এবং পরের দিন প্রাতরাশও পাবো। নিকটেই একটি তাঁবুতে খাবার দেওয়া হোত; যারা থাকতে চাইত বেশী দিন তাদের ঐ ক্যাম্পের খাতায় নাম লেখাতে হোত। তিনি আমাকে তিনটি কম্বল দিলেন এবং কোন খালি চৌকি আমাকে না দিতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি সিমেণ্টের মেঝের উপরে কম্বলগুলো পেতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে আমার ঘুম ভেঙে গেল সমবেত কাশির শব্দে; গলা খাঁকারি, কলের জলের শব্দ আর হলঘরের পিছনে অবিশ্রান্ত জল দিয়ে পায়খানা পরিষ্কারের শব্দও আমার নিদ্রাভঙ্গে সহায়তা করেছিল। আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন সেখানে ছিলাম নানান বয়সের নানান বর্ণের মানুষ; আমাদের প্রায় সকলেরই পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র। কেরানীবাবুটি আমাদের প্রত্যেককে প্রাতরাশের জন্য টিকিট দিয়ে দিলেন, রেল লাইনের কাছাকাছি খাবার দেবার ঐ ক্যাম্পটি এই হল থেকে কয়েকটি ব্লকের পরে। আমরা ওখানে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়ালাম।

বাইরে থেকে ক্যাম্পটিকে দেখে মনে হল যেন আধা কারখানা আধা জেলখানা, উঁচু তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা; ভেতরে তিনটে বড় বড় শেড আর বড় থামের মাথায় আরও বড় একটা বয়লার বসানো, তা থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে। নীল কুর্তা আর পাজামা-পরা লোকেরা বালুময় উঠোনে বেড়াচ্ছে, একটা বাড়ীর সামনে একটা ঘণ্টা ঝোলানো আছে, সেটা বাজিয়ে প্রাতরাশের সময় ঘোষণা করা হোল। যাঁরা ক্যাম্পে স্থায়ীভাবে থাকেন তাঁরা লম্বা সারিতে বসে প্রথমে প্রাতরাশ খেলেন, তারপর আমরা আমাদের টিকিট গেটে জমা দিয়ে ভিতরে সারিবন্দী হয়ে প্রবেশ করলাম, প্রচুর ভালো খাবার খেলাম। প্রাতরাশের পরে আমাদের দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কাউকে কাউকে বলতে শুনলাম যে রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে এই ধরনের যে আশ্রয়-শিবিরগুলি আছে সেগুলি আরও ভালো এবং তাঁরা উত্তরগামী মালগাড়ীতে চড়ে সেদিকে যাবার তোড়জোড় করলো। আমি এল সেণ্ট্রোর এই শিবিরে থাকাই মনস্থ করলাম।

শিবিরে নাম লেখানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আমি এটি পরিষ্কার ভেবে নিতে চেয়েছিলাম, এই আশ্রয় শিবিরে বড় বড় স্নানের জলের পাত্র এবং সাবানও ছিল, তাছাড়া সেখানে ধারাস্নানেরও ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য জলসেচের যে সব খাল ছিল সেখানে গিয়েও আমি স্নান করা এবং কাপড়-চোপড় কাচার কাজটুকু সেরে নিতে পারতাম ; কিন্তু এই আশ্রয়-শিবিরে আমার বিশ্রাম করার সুযোগ ছিল, পেটের কোঁচকানো কোঁচকানো দাগগুলো দূর করবার অবকাশ ছিল, আর তা ছাড়া আমি ধীরে সুস্থে পরিষ্কারও হয়ে নিতে পারতাম। এক কথায় এটাই ছিল সব চেয়ে সহজ পথ।

নাম লেখানোর আগে খুব সংক্ষিপ্ত একটি সাক্ষাৎকার এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিতে হোত, শিবিরে প্রায় তুশো লোক ছিল। বছরের পর বছর ধরে আমি যে সব লোকের সঙ্গে কাজ করেছিলাম এবং যাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি তাদের মতো লোকেরাই এখানে থাকতো। ক্ষেতে খামারে এবং ফলবাগানে যাদের সঙ্গে কাজ করেছি তাদের অনেকেরই চেনামুখ এখানে দেখলাম। তবুও একটা অদ্ভুত অপরিচয়ের অনুভূতি আমার মনে ছায়াপাত করলো। জনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। একদল মানুষের সঙ্গে কাজ করা এবং ঘুরে বেড়ানো এক কথা আর তুশো লোকের সঙ্গে খাওয়া ঘুমানো সারাটা দিন একসঙ্গে কাটানো এ হোল অন্য কথা।

আমি বহুবিচিত্র বিষয়ে ভাবতে শুরু করলাম : এই মানুষগুলোর এত পেটই বা কামড়ায় কেন আর এরা এত নালিশই বা জানায় কেন? আমার মনে হয় এগুলো ওদের অভাব-অভিযোগের অভিব্যক্তি নয়, এগুলো রীতিকণ্ডূয়ন মাত্র। অদ্ভুত এদের শৃঙ্খলাবোধ, হাস্যকর গাম্ভীর্য দেখা যেত ওদের তাস, দাবা ও পাশাখেলার সময়ে, প্রায়ই অদ্ভুত ভঙ্গীতে ওরা তর্কও করতো। আমি প্রায়ই একথা ভাবতাম যে এ লোকগুলো এই ক্যাম্পে এলো কেন? সাময়িক ভাবে কি ওরা অভাব অনটনে পড়েছে? চাকরি পেলেই কি ওদের সব অসুবিধা দূর হবে? আমরা কি সত্যি সত্যিই বাইরের মানুষদের মতোই সহজ এবং স্বাভাবিক?

তখন পর্যন্ত আমি জানতাম না যে আমি একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ। আমি নিজেকে মানুষ বলেই ভাবতাম, ভালো-মন্দের ধার ধারতাম না, তবে

মোটামুটি কারোর ক্ষতি করতাম না। যাদের সঙ্গে ঘুরে বেঁড়িয়েছি এবং কাজ করেছি তাদের আমেরিকাবাসী এবং মেক্সিকোবাসী বলে জেনেছি, কালা এবং ধলা বলে জেনেছি, উত্তর অঞ্চলের এবং দক্ষিণী মানুষ বলে জেনেছি। এটা আমার মনে হয়েছিল যে আমাদের দলেব সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কতকগুলে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, আমাদের মধ্যে সহজাত অথবা আহৃত এমন কতকগুলো গুণ ছিল যার ফলে আমাদের জীবনযাত্রার ধারাও পাল্টে গিয়েছিল।

একটা ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে আমার নতুন পথের সন্ধান পেলাম।

আমি শান্তশিষ্ট একটি বর্ষীয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রায়ই কথা বলতাম; তাঁর নরম কথাবার্তা এবং প্রীতিপ্রদ ব্যবহার আমার ভালো লাগতো। আমরা পরস্পরের তুচ্ছ অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করলাম, তারপর তিনি চেকার্স (দাবা জাতীয় ড্রাফ্‌ট খেলা) খেলার প্রস্তাব করলেন। বোর্ডে গুটি সাজাবার সময়ে তার ছিন্নাবশেষ ডান হাতটাকে দেখে আমি চমকে উঠলাম, কেননা পূর্বে এটি আমি লক্ষ্য করিনি। লম্বালম্বিভাবে হাতের আধখানা কেটে নেওয়া হয়েছিল এবং এই তিনটি আঙুলওয়ালা কাটা হাতটি দেখাতো ঠিক মুরগীর পায়ের মতো। আমার চোখের সামনে ঐ কাটা হাতটি নাড়াচাড়া করার পূর্বে আমি যে ওটাকে লক্ষ্য করিনি এই ভেবে খুব লজ্জিত হয়ে পড়লাম। আমার পর্যবেক্ষণ শক্তির ন্যূনতাটুকু পুষিয়ে নেবার জন্য আমি তারপর থেকে আমার চার পাশের মানুষদের হাতের দিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম এবং ফল হল খুব বিস্ময়কর। আমার মনে হোল যে প্রায় প্রত্যেকটি মানুষই কোন-না-কোন ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল; একজনের একটিমাত্র হাত ছিল, কয়েকজন খুঁড়িয়ে চলতো, একটি সুদর্শন যুবকের একটি পা ছিল কাঠের। দেখে মনে হোল যে এঁদের প্রায় সবাই কোনো যন্ত্র-দানবের বিকট দশন থেকে কোন রকমে মুক্তি পেয়ে পালিয়ে এসেছে এবং তাঁদের কোন-না-কোন অঙ্গহানি ঘটেছে।

আমি জানতাম যে আমার এ ধারণা কিছু পরিমাণে অতিরঞ্জিত, কিন্তু খাবার সময়ে যখন সবাই উঠোনে সারিবন্দী হয়ে দাঁড়াল তখন আমি তাদের সংখ্যা গণনা করলাম, আবিষ্কার করলাম যে প্রায় দু'শ লোকের মধ্যে অন্ততঃ ত্রিশজনের হাত অকেজো অথবা পা পঙ্গু হয়ে গেছে। আমি অনুমান করতে পারলাম যে এই ধরনের গণনা আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। এই

শিবিরে আমরা হলাম "মানুষের আবর্জনা স্তূপ" এটির আগে উপমাটি দিয়েই বসে আছি।

এই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গী ভবঘুরেদের মানুষ হিসাবে দেখলাম এবং তাদের মুখের চেহারা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। যুবকদের মধ্যে কতগুলি মুখ বেশ সুশ্রী, মধ্যবয়সী এবং বুড়োদের মধ্যে কয়েকজনকে বেশ স্বাস্থ্যবান এবং সযত্ন-পোষিত দেহের অধিকারী বলে মনে হয়েছিল কিন্তু বিকৃত ও বিধ্বস্ত মুখের সংখ্যাই বেশী, খোলা-ছাড়ানো কুলের মতো অনেক মুখেই কুঞ্চনের রেখা; কারোর কারোর মুখ ফোলা ফোলা, কারোর কারোর বা নাক লাল হয়ে ফুলে উঠেছে, কারোও বা নাক ভাঙ্গা, কারও বা বিরাট নাসারন্ধ্র। অনেকেরই সব দাঁত পড়ে গিয়েছিল (আমি গুণলাম আঠাত্তর জনের)। আমি লক্ষ্য করলাম অনেকেরই চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ অথবা আচ্ছন্ন, চোখগুলো অস্বচ্ছ অথবা রক্তরাঙা। আমি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে বুড়ো লোকগুলোর বয়স কেবলমাত্র তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায়, তাদের মেদহীন শরীরে কঠোর ঋজুতা। ৬০ বছরেরও বেশী বয়সের এক ছোটখাটো বুড়োকে পিছন থেকে দেখলে মনে হবে একেবারে বালকের মতো। বলিচিহ্নিত মুখ একটি বালকের শরীরে যদি জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে তা দেখে চমকে উঠতে হয়।

আমার দ্বিধা সংশয় প্রায় চলে গিয়েছিল, শিবিরের সবার সঙ্গেই আমার পরিচয় ঘটল। এরা খুবই বন্ধুভাবাপন্ন, তবে এরা কথা বলে বেশী। কয়েক সপ্তাহ পার হবার আগেই আমি প্রায় সবার সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিলাম।

আমার গোনারও শেষ ছিল না। শিবিরের দু'শ লোকের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ করলে এই রকম দাঁড়ায়: পঙ্গু···৩০ জন, পাঁড় মাতাল···৬০ জন, বুড়ো মানুষ (৫৫ ও তদূর্ধ্ব)·৫০, বিশ বছরের কম বয়সের যুবক···১০ জন, ক্ষয়, হাঁপানি হৃদরোগ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ ১২ জন, ক্ষ্যাপাটে মানুষ ..৪ জন, অলস প্রকৃতির মানুষ···৬ জন, জেল-পালানো মানুষ ৪···জন, আপাত দৃষ্টিতে স্বাভাবিক মানুষ ৭০ জন, এদের মোট সংখ্যা দু'শরও বেশী হয়ে গেল (তার কারণ একই মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে একাধিকবার গণনা করা হয়েছে)। অন্য কথায় বলা যায় শিবিরের অর্ধেক লোক (৭০ জন স্বাভাবিক মানুষ এবং ১০ জন যুবক) হোল বেকার, চাকরি পেলেই এদের দুঃখ দূর হবে

আর বাকী শতকরা ৬০ জনের বেকারত্ব ছাড়াও দৈহিক অক্ষমতা ছিল।

ঐ দলের মধ্যে ৫০ জন ছিলেন যুদ্ধ ফেরত এবং ৮০ জন ছিলেন ১৬টি বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্পে পারদর্শী কারিগর। ঐ দুরারোগ্য ব্যাধিতে যারা ভুগছিলেন তাঁদের নিয়ে সকলেই কর্ম্মক্ষম ছিলেন। ওদের মধ্যে এক হাত-ওয়ালা লোকটি কাজের সময় কোদাল দিয়ে 'ভানুমতীর খেল' দেখাত।

ওদের বুদ্ধি এবং চরিত্র সম্বন্ধে আমি কোন সুনির্দিষ্ট মতামত তৈরিই করতে পারি নি কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে শিবিরের লোকেদের বুদ্ধি সাধারণের থেকে নিম্নমানের মোটেই ছিল না। তাদের চরিত্র সম্বন্ধে বলতে পারি যে ধৈর্য এবং খোশমেজাজ তাদের ছিল। জঘন্য দ্বেষ-হিংসার দৃষ্টান্ত একেবারেই দেখি নি। তবুও একথা হয়তো বলা চলে যে এদের চরিত্রের দার্ঢ্য খুব বেশী ছিল না, আপন আপন প্রবৃত্তির নিরোধ করা, এবং পৃথিবীর গড্ডলিকা স্রোতের প্রতিরোধ করা চরিত্র গঠন ব্যাপারে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভবঘুরে মানুষেরা তাদের প্রবৃত্তির দাস, জীবনের সবচেয়ে সহজ পথে তারা গতায়াত করে। আমাদের বাইরের ভদ্রবেশী আবরণ এবং ভ্রাম্যমাণ শ্রমজীবী হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব, এতদুভয়ের সম্বন্ধটুকু বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগলো। আমাদের মধ্যে বেশী সংখ্যক লোকই কোন বাঁধাকাজ করতে পারতো না। আমাদের মধ্যে আত্ম-সংযমের অভাব ছিল এবং একঘেয়ে কাজে আমরা খুব বেশী সময় কাটাতে পারতাম না। হয়তো গোড়া থেকেই আমরা সব রকম কাজের অনুপযুক্ত ছিলাম। কোনো বাঁধাধরা কাজে আমাদের যোগটুকু হঠাৎ সংঘটিত কোনো দুর্ঘটনার মতো; আমাদের মধ্যে কয়েকজন বিকলাঙ্গ হয়ে গেল, কয়েকজনা ভয় খেয়ে পালিয়ে গেল আর কয়েকজন মদ্যপ হয়ে উঠল। আমরা সব দ্বন্দ্ব সংঘাতের পথ এড়িয়ে খোলা রাস্তায় যেতে চেয়েছি। ভ্রাম্যমান শ্রমজীবীর জীবনে অনেক বৈচিত্র্য এবং তাঁর জীবনে আত্ম সংযমের খুব অল্পই দেখা পাই। সুশৃঙ্খল সমাজ জীবনের একটি নালার মধ্যে যেন আমরা পড়ে আছি, সম্ভ্রান্ত মানুষদের মধ্যে যেন আমাদের স্থান নেই এবং আমরা আমাদের বর্তমান আশ্রয়ে এসেছি নর্দমার পঙ্কিল পথ বেয়ে।

তবুও আমি ভাবতে লাগলাম যে এই পৃথিবীতে এমন কাজ নিশ্চয়ই

রয়েছে যার আবেদন আমাদের কাছে খুবই প্রবল এবং আমরা যদি এই কাজটুকুকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করি তাহলে চিরতরে আমাদের অশান্তি দূর হবে এবং আমরা এই কাজকেই আঁকড়ে ধরে থাকব।

চার সপ্তাহের মতো আমি আশ্রয় শিবিরে ছিলাম, তারপরে শহরের কাছেই আমি খড় নিড়ানোর কাজ পাই, তারপর এপ্রিল মাসে যখন গরম হাওয়া বইতে লাগলো, আমি আমার বিছানাটা কাঁধে তুলে স্যান বার্নার-ডিনোর পথে যাত্রা করলাম। পরের দিন সকালে আমি একটি ট্রাকে চড়ে ইণ্ডিয়োতে এসে পৌছানোর পর আমার মাথায় এক নতুন চিন্তা এল। ইণ্ডিয়ো থেকে বাইরে যাবার বড় রাস্তাটা খেজুর গাছের ঢেউ খেলানো কুঞ্জের মধ্যে দিয়ে গেছে, সুগন্ধি দ্রাক্ষাক্ষেতের মধ্য দিয়ে, আলফালফা ক্ষেতের সবুজের ভেতর দিয়ে গিয়ে রাস্তাটা হঠাৎ এক সাদা বালুর মরুভূমিতে পড়েছে। সবুজ বাগিচা এবং মরুভূমির মধ্যেকার সীমারেখাটা অদ্ভুত দেখায়, সাদা বালুর বিস্তার হঠাৎ কখন বাগিচার সবুজে রূপ নিল এটা আমার কাছে পরম বিস্ময়ের আমার মনে হোল যে এই ধরনের একটা কাজে আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, এমন কি আশ্রয় শিবিরের মানুষগুলোও। সাধারণ আমেরিকাবাসীর গড় পড়তা বুদ্ধি এবং শক্তি ওদের প্রত্যেকেরই ছিল কিন্তু আমার মনে হয় ওদের কর্ম্মশক্তির উজ্জীবন ঘটানো যায় কোন একটি কাজের ভার ওদের উপর দিয়ে, সেই কাজের মধ্যে বিস্ময়কর কিছু থাকলে ওদের কাজে উৎসাহিত করা যায়। মরুভূমিতে ফুল ফোটানোর কাজে পথিকৃৎ হবার জন্য ওরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে।

ভবঘুরে মানুষেরা আবার পথিকৃৎ হবে? এ অসম্ভব। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ, শিশুরা পর্যন্ত জানে যে পথিকৃতেরা সবাই বিরাট পুরুষ, তাদের সীমাহীন সাহস এবং অদম্য শক্তি। যাই হোক, আমি যখন এই সাদা বালুর ওপর পদচারণা করছিলাম তখন আমি এই ধরনের চিন্তা করছিলাম, কারা এই পথিকৃৎ? কারা সেই মানুষের দল যারা তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে বনে জঙ্গলে চলে গেল? মানুষ কর্ষিত কোমল ভূমির আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে বড় একটা কঠোরতা এবং দুঃখকষ্টের মধ্যে যেতে চায় না। লোকেরা যেখানে থাকে সেই স্থানের প্রতি তার একটা মায়া পড়ে যায়। তারা মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে। বাসস্থান পাল্টানো হোল শেকড় টেনে

ছেঁড়ার মতো খুবই কষ্টকর। যে মানুষ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সমাজে সম্মানিত সে একটু সরে থাকতে চায়। ঋদ্ধিবান ব্যবসায়ী কৃষক এবং শ্রমিক তাদের স্ব স্ব স্থানে থাকতে ভালবাসে। তা হলে কারা এই অজ্ঞাত বনে-বাদাড়ে স্বেচ্ছায় যেতে চাইল? নিশ্চয়ই তারা নয় যারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত। যারা গিয়েছিল তারা কেউই গণ্যমান্য নয়, অধিকাংশই হতোদ্যম। এদের কর্মশক্তির অভাব ছিল না কিন্তু তারা রুটিন-বাঁধা জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত না; এরা সব এদের প্রবৃত্তির দাস—মদ্যপ, জুয়াড়ী এবং নারী-মাংসলোভী, এরা একঘরে, এরা জেলপালানো, এরা আইনের চোখে পলাতক। নিঃসন্দেহে কয়েকজন এদের মধ্যে স্বাস্থ্যান্বেষী ছিল—যক্ষ্মা, হাঁপানি, হৃদরোগ ইত্যাদি ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত মানুষ। সর্বোপরি দুঃসাহসিক অভিযানের আহ্বানে কয়েকজন যুবক ও মধ্যবয়সী মানুষও এদের দলে এসে ভিড়েছিল।

এরা সকলেই পরিবর্তন চেয়েছিল; এদের মধ্যে কয়েকজন অন্ধভাবে বিশ্বাস করতো যে স্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাগ্যেরও পরিবর্তন ঘটে। এদের মধ্যে অনেকেই এমন একটি জায়গায় যেতে চাইল যেখানে কেউ তাদের চেনে না এবং যেখানে তারা নতুন করে জীবন শুরু করতে পারতো। কঠিন পরিশ্রম এবং দুঃখ বরণ করার জন্য তারা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেনি। পরিশেষে তারা যে বড বড় কাজের গুরু দায়িত্ব বহন করলো, অবর্ণনীয় দুঃখ বরণ করলো এবং অসম্ভবকে সম্ভব করলো তার কারণ এটি না করে তাদের উপায় ছিল না। কাজের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তারা কাজের মানুষ হয়ে উঠল। অপ্রতিরোধ্য বাঁচার লড়াইয়ে নেমে তারা শক্তি এবং সামর্থ্য অর্জন করলো। এটা ছিল তাদের কাছে মরা-বাঁচার প্রশ্ন এবং একবার তারা জয়ের স্বাদ যখন পেল তখন তারা আরও জয়ের নেশায় মেতে উঠল।

এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আজকের দিনের ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকেরা এবং ভবঘুরের দলই অতীতে পথিকৃতের কাজ করেছিল। পথিকৃতেরা আজকের দিনের 'দেশের মানুষদের' তাদের বংশধরদের চেয়ে যে বেশ কিছুটা পৃথক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আজকের দিনে যদি নতুন পথের অগ্রদূতেরা—১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণ সন্ধানে যে সব ভাগ্যান্বেষী ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়েছিলেন তাদের যমজ ভাইয়েরা—দলে দলে আসতেন নব্য পোশাকে নিজেদের আচ্ছাদিত করে তাহলে ক্যালিফোর্নিয়ার নাগরিকেরা এদের ভালোচোখে

দেখত না ; তাদের নীতি স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির প্রতিকূল বলেই গণ্য করতো।

সব নতুন দেশে বসতি স্থাপনের ব্যাপারেই এটা সত্যি ; অবশ্য কয়েকটি ব্যতিক্রমও আছে। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে বসতি স্থাপন করলেন দাগী আসামীর দল ; দাগী আসামী এবং নির্বাসিত মানুষেরা সাইবেরিয়াতে বসতি স্থাপন করলো। আমাদের দেশেও যাঁরা প্রথমে বসবাস করতে এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই জীবনে বিফল মনোরথ শরণার্থী এবং দুষ্কৃতকারীর দল। এর ব্যতিক্রম ছিলেন তাঁরা যাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ধর্মোন্মাদনায়, যেমন পিলগ্রিম ফাদার্স* এবং মরমনরা †।

যদিও যুক্তিসংগত তবুও এই ধরনের চিন্তা আমাদের কাছে রসিকতা বলেই বোধ হয়েছিল। অতি উৎসাহের বশবর্তী হয়ে আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে পথ অতিক্রম করছিলাম এবং অচিরেই আমি এলিসের মর্কস্থানে এসে পৌছালাম। একটা খালি ট্রাকে করে আমি ব্যানিং এবং বোমণ্ট-এর মধ্য দিয়ে অতিক্রুত নদীর ধারে এসে পৌছালাম এবং সেখান থেকে সাত মাইল পায়ে হেঁটে স্যান বার্নারডিনোতে উপনীত হলাম।

এই ভবঘুরে মানুষদের সঙ্গে পথিকৃৎদের একটা আত্মিক সৌসাদৃশ্য আবিষ্কার করে আমি ক্রমেই এই ধারণাটিকে বদ্ধমূল করে তুললাম এবং কালক্রমে এর স্বপক্ষে অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করলাম, আপাতদৃষ্টিতে এদের মধ্যে হয়তো কোনো সম্বন্ধই নেই। এবং ক্রমে এমন সব বিষয়ে আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানতাম না এবং আমার কোনো জানবার আগ্রহ ছিল না।

আমি সে কালের কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। তাদের মধ্যে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ এবং স্থানীয় লোক ; অপরেরা স্যাক্রামেন্টো, প্লেসারভিল, অবর্ণ এবং ফ্রেজনোর অধিবাসী। আমি যে খবর চাইছিলাম তা পাওয়া খুব সহজ ছিল না, সোজাসুজি প্রশ্ন করার অসুবিধা ছিল। আমি প্রশ্ন করলাম যে এই দেশে প্রথম যারা বসবাস করেছিল তারা কেমন মানুষ

* পিলগ্রিম ফাদার্স—যে সকল স্বাতন্ত্র্যকামী পিউরিটান ইংরেজ আমেরিকায় গিয়ে প্লিমাথ এবং ম্যাসাচুসেটস্ উপনিবেশ স্থাপন করেন।

† মরমন্—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জোসেফ স্মিথ কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত একটি খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্যরা মরমন্ নামে অভিহিত।

ছিল। উত্তর পেলাম তারা খুব পরিশ্রমী এবং রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ। তারা মদ খেতো, জুয়া খেলতো, এবং নারীসম্ভোগ করতো। তাদের বিলাসিতার সীমা-পরিসীমা ছিল না, আবার অবস্থার বিপর্যয় ঘটলে দীনভাবে থাকতেও তাদের অসুবিধা হোত না। তারা হোল পৃথিবীর মাটির প্রাণদায়ী রসটুকু। তবুও এটি খুব পরিষ্কার বোঝা যায়নি যে ওরা কি ধরনের মানুষ। যদি আমি প্রশ্ন করতাম যে ওরা দেখতে কি রকম, উত্তর পেতাম ওদের গোঁফ আছে, ওরা চওড়া প্রান্তওয়ালা হ্যাট পরে, উঁচু বুট পায়ে দেয় ও নানান রংয়ের কুর্তা গায়ে পরে ; ওদের রোদে পোড়া তামাটে মুখ ও হাড় বের করা হাত। সবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করেছি: 'আজকের দিনের ক্যালিফোর্নিয়ার কি ধরনের লোকদের সঙ্গে এই পথিকৃৎদের খুব সাদৃশ্য আছে?' কিছুটা ইতস্ততঃ করে ওরা সেই একই উত্তর দিত, 'ওকিদের* এবং হতচ্ছাড়া এবং ভবঘুরে লোকেদের সঙ্গে।'

আমি এই ভবঘুরেদের কর্মরত অবস্থায় দেখে এদের নব্য পথিকৃতের ভূমিকায় ভাবতে চেষ্টা করতাম, আমি তাদের গাছ কাটতে দেখেছি, প্রেয়রির আগুন অথবা দাবানল প্রতিরোধের জন্য এক ফালি কর্ষিত অথবা পরিষ্কৃত জমি করতে দেখেছি, পাথরের দেওয়াল তৈরি করতে দেখেছি, ব্যারাক এবং বাঁধ তৈরি করতে এবং রাস্তা নির্মাণ করতে দেখেছি ; ট্রাকটর ও বুলডোজার চালাতে দেখেছি, বাষ্পচালিত বেলচা নিয়ে কাজ করতে দেখেছি এবং কন্‌ক্রিট মেশানোর যন্ত্র (Concrete Mixer) চালাতে দেখেছি। সারারাত মদ খেয়ে তারপরের সারাটা দিন কঠোর পরিশ্রম করতে দেখেছি এদের। তাদের ঘাম ঝরে পড়েছে, তারা হয়তো রাগে গরগরও করেছে কিন্তু তারা সমানে কাজ করে গেছে। এই ভবঘুরেদের দেখেছি ফোরম্যান ও সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করতে। এই দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত দৈহিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি, কুঞ্চিত মুখের বলিরেখা অন্তর্হিত হয়েছে, ত্বকে একটা স্বাস্থ্যের জৌলুষ দেখা গেছে ; ভাবলেশহীন মুখে দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে, ঘোলাটে চোখে উজ্জ্বলতা দেখা

* ওকি (okie)—ওকলাহোমার লোক। আগেকার দিনে বহু ওকি অনাবৃষ্টি প্লেগ ইত্যাদি দৈব দুর্ঘটনার দরুন নিজের জমি ছেড়ে ক্রমাগত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল।

দিয়েছে ; গলার স্বরও পালটে গেছে ; এমন কি তাদের দৈহিক উচ্চতাও যেন একটু বেড়ে গিয়েছে বলে আপাত প্রতীয়মান হয়েছে। এবং অনতিবিলম্বে তাদের মধ্যে এমন একটা ভাব এসেছে যেন তারা সারা জীবনই এই ধরনের উচ্চ পদে কাজ করছে। তবুও শীঘ্র অথবা বিলম্বে হয়তো আবার তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে, হয় রেলের রাস্তায় অথবা কোন চোরা গলিতে অথবা কোন মাঠে—আবার তারা ভবঘুরে হয়ে পড়েছে। সবারই সেই একই ধরনের ইতিহাস ; হয় তারা মদ খেয়ে রাগারাগি করে চাকরিটি খুইয়েছে, নতুবা এই ধরনের রুটিন-বাঁধা কাজে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে তারা এই কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সাধারণতঃ একজন ভবঘুরে যখন ফোরম্যান হয় তখন সে তার তাঁবে যে সব ভবঘুরে কাজ করে তাদের প্রতি খুব সযত্ন আচরণ করে। কেননা সে জানে যে তার হিসাব-নিকাশের দিন হয়তো খুব বেশী দূরে নয়। সংক্ষেপে ভবঘুরেদের পথিকৃতের ভূমিকায় দেখা খুব শক্ত নয়। আমি ভেবেছি যে, প্রকৃতির সঙ্গে যদি তাদের একা একা মরণ-বাঁচনের লড়াই করতে হয় তাহলে তারা তাদের প্রতিরোধ শক্তির প্রমাণ নিশ্চয়ই দিতে পারে। কেননা, দায়িত্বের গুরুভার এবং সংগ্রামের উন্মাদনা মানুষের চরিত্রকে ইস্পাতের মতো দৃঢ়তর করে। যারা খাপ খাওয়াতে পারবে না তারা ধ্বংস হবে এবং যারা টিকে থাকবে তারাই সার্থক পথিকৃতের মর্যাদা পাবে।

যে সব মানুষ উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পথিকৃতের সম্মান পেয়েছেন সেরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি ভেবে দেখেছি ; অর্থাৎ বিত্তবান পূর্বতন ঔপনিবেশিকরা যে নেতৃত্ব করেছেন তাঁদের কথা বলছি। তাঁরা হয়তো তাদের পূর্বতন মাতৃভূমির উচ্চশ্রেণীর মানুষ। এইসব দৃষ্টান্ত দেখে আমার মনে হয়েছে যে এইসব ক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল। চাষ-আবাদকারী সমাজে, যে সমাজে বড় বড় জোতদার এবং স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষ অথবা আমদানী করা শ্রমজীবীরা বাস করে সেই সমাজে এই ধরনের পথিকৃৎদের কাজের সুবর্ণ সুযোগ, এদের উভয়ের মধ্যে একটা জাতিগত বৈষম্য থেকে যায়। বাল্টিক উপকূলে টিউটনিক ভূম্যধিকারীদের উপনিবেশ স্থাপন, ট্রানসিলভেনিয়ায় হাঙ্গেরীয় অভিজাতদের বসবাস, আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংরাজদের আধিপত্য, আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে বড় বড় আবাদকারীদের চাষের পত্তন এবং কেনিয়া ও অন্যান্য ব্রিটিশ এবং

ওলন্দাজ উপনিবেশে যে সব বড় বড় আবাদী জমির মালিক বা কর্মকর্তারা চাষের পত্তন করেছিল তাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। তাদের গুণ যাই থাক না কেন, নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি তাদের ছিল না। তাদের প্রতিপত্তি সাধারণতঃ ভেঙ্গে পড়তো শ্রমিক বিপ্লবের মাধ্যমে অথবা নবাগত শ্রমজীবীদের আগমনে, এই শ্রমিকজীবীরা জমিদারদের স্বজাতীয় এবং স্বদেশবাসী ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, অবশ্য উভয় পক্ষের মধ্যে সংগতির অভাব হলে যে যুদ্ধ বাধতোই তা নয়। এমন কি আমাদের সুপ্রাচীন দক্ষিণ দেশও যুদ্ধ ছাড়াই হয়তো সুস্থ এবং স্বপ্ন হয়ে উঠতো যদি না বিচ্ছিন্নতাজনিত জটিলতার সৃষ্টি হত। হয়তো দক্ষিণের দরিদ্র শ্বেতকায় মানুষেরা অথবা অন্যান্য দেশ থেকে আগত মানুষেরা এটিকে সম্ভব করে তুলতো।

আমাদের মধ্যে একটা অসংগত অলৌকিক প্রবণতা রয়েছে, আমরা একটা জাতিকে অথবা রাষ্ট্রকে অথবা একটি প্রতিষ্ঠানকেও তার সবচেয়ে অযোগ্য মানুষদের দিয়ে বিচার করি। অবশ্য এই ধরনের বিচারের খানিকটা সার্থকতা আছে। কেননা নিকৃষ্ট ধরনের মানুষদের প্রকৃতি এবং চারিত্রিক বলেই একটা জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। একটা জাতির অকর্মণ্য মানুষেরা থাকে তার মাঝেব অংশকে আশ্রয় করে। শহরে এবং গ্রামে যে পরিশ্রমী সদাচারী বিত্তশালী সন্তুষ্ট প্রকৃতির মধ্যবিত্ত সমাজ রয়েছে তারা উপরের এবং নীচের তলার সংখ্যালঘু মানুষদের দ্বারা আকারিত হয়।

একটা জাতির গঠনে উঁচু দরের যে সব মানুষ রয়েছে তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তারা কেউ কেউ রাজনীতিবিদ্, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক অথবা ধর্মপ্রচারক। অন্যপ্রান্তে যে সব গরীব সমাজচ্যুত, অক্ষম ও আবেগপ্রবণ মানুষ রয়েছে তারাও জাতিগঠনে সহায় করে। এই নিকৃষ্ট অপদার্থ মানুষগুলোর গঠনশক্তি কম নয়, কেননা তাদের সহজেই যে কোন দিকেই কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়। তাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার শক্তি এবং ঝুঁকি নেবার প্রবণতাই তাদের এ বৈশিষ্ট্যটুকু দিয়েছে। তারা তাদের অতি সাধারণ অপচায়িত জীবনটুকুকে কোন একটা মহৎ এবং পূর্ণতর কাজে লাগাতে চায়। তাই দেখি তারাই নতুন ধর্মকে সাগ্রহে বরণ করে, রাজনৈতিক অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানায়, তাদের

মধ্যেই দেশপ্রেমের উগ্র ভাবাবেগ ও উত্তেজনা প্রবলতর; তারাই নতুন দেশ দেশান্তরের দিকে দলবেঁধে ছুটে যায়।

একটা জাতির উৎকর্ষ, তার আত্যন্তিক মূল্যটুকু বোঝা যায় যখন তার নীচের তলার মানুষেরা উপরে ওঠে। তারা কতখানি সাহসী, কতখানি দয়াপরবশ, কতটুকু শৃঙ্খলাবোধ তাদের আছে, কতটুকু পারদর্শিতা তাদের আছে, তারা কতখানি উদার এবং তারা কতখানি স্ববশ অথবা পরবশ এসকলের মধ্য দিয়েই তাদের মূল্য যাচাই হয়। সম্মান, সত্য এবং মানবত্মার মর্যাদা রাখতে গিয়ে তারা কতদূর যেতে পারে তার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই তাদের মূল্য যাচাই হয়।

আজকের আমেরিকার সাধারণ মানুষ খুব চটে ওঠে যদি তাকে বলা হয় যে এই দেশটি গড়ে উঠেছে ইউরোপ থেকে আগত অবাঞ্ছিত মানুষদের যত্নে। অবশ্য এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে অপমানের কিছু নেই, বরং আনন্দের হেতু আছে, আমাদের মূল বংশ অর্থাৎ পিতৃপুরুষের গর্বেই আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। আমাদের এই বিরাট মহাদেশটা পূর্ব-গোলার্ধের অতি সাধারণ মানুষদের হাতে গড়া একথা ভাবলেও আনন্দ হয়। আমাদের এই শহর, নগর, কলকারখানা বাঁধ, কৃত্রিম জলপ্রণালী, ক্ষেতখামার, বন্দর, রাস্তাঘাট, রেল লাইন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, স্কুল-কলেজ এবং বাগ বা পার্ক তৈরি করেছে পুর্ব গোলার্ধের সেই মানুষেরাই যাদের আত্মীয়রা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেও দেশে ভারবাহী পশুর মতই ছিল; তাদের প্রভু—রাজা রাজড়া পুরোহিত এবং অভিজাতদের—সম্পত্তি মাত্র ছিল এবং যাদের নিজের বলতে অভিলাষ আকাঙ্ক্ষা কিছুই ছিল না। ইউরোপে যদি হঠাৎ কখনো কোন দুর্লভ সুযোগে কোন নীচের তলার মানুষ শীর্ষস্থানে আরোহণ করত, তাহলে গতানুগতিক প্রথাটাকে সে বাঁচিয়ে তো রাখতোই বরং তাকে আরও জোরদার করতো। কর্সিকার সেই ছোট্ট নিম্নপদস্থ সৈনিকটি ফরাসী বিপ্লবের পরে যে প্রাণশক্তি মুক্তি লাভ করলো তাকে এক সোনায় মোড়া রাজকীয় গাড়ীতে জুতে দিল। হ্যাপসবুর্গবংশোদ্ভূত রাজ-রাজড়াদের রক্তের সঙ্গে আপন রক্তের মিলন ঘটানোটুকু ছাড়া সে আর বড় কিছুই ভাবতে পারলো না; একটা নতুন রাজবংশের পত্তন সে করতে চাইল। আমাদের সময়ে ইটালীতে একজন রাজমিস্ত্রি, জার্মানীতে একজন রঙের মিস্ত্রি এবং রাশিয়াতে একটি মুচির ছেলে

এরা তাদের আপন আপন জাতির নিয়ন্তা হোল এবং এরা যা করলো তা হোল পুরাণো প্রথারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

কেবলমাত্র আমেরিকাতেই পূর্ব গোলার্ধের সাধারণ মানুষেরা তাদের আপন শক্তির স্বনির্ভর প্রকাশটুকু দেখাতে সুযোগ পেল; তাদের উপর হুকুম চালিয়ে তাদের তাড়না করে তাদের কাজ করানোর প্রয়োজন হয়নি। ইতিহাস একটি মাটি কোঁপান রসিকতা করে বসলো যখন সে ইউরোপ থেকে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর কৃষিজীবী দোকানদার, শ্রমজীবী বাউণ্ডুলে, জেল-ফেরত এবং মাতাল মানুষকে ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে একটা বিরাট অকর্ষিত মহাদেশে ছেড়ে দিয়ে বললো "ওখানে যাও, ওটা তোমাদের।"

এবং এই নগণ্য মানুষেরা কাজের গুরুত্ব দেখে ভয় পায় নি। যে কর্মশক্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঘুমিয়েছিল তার মুক্তি ঘটল। তারা কোদাল, কুড়ুল, গাঁইতি, লাঙ্গল নিয়ে জমি চষে ফেলল; পায়ে হেঁটে, ঘোড়ার পিঠে, নৌকা বেয়ে, গাড়ীতে চড়ে তারা এই নতুন মহাদেশে গিয়ে পৌছাল। তারা সেখানে এলো গান করতে করতে, প্রার্থনা করতে করতে; তাঁরা চেঁচাল, মদ খেলো, মারামারি করলো। মানুষদের জন্য রাস্তা করে দাও, পূর্ব গোলার্ধ থেকে অবাঞ্ছিত লোকেরা এসে গড়েছে এ কথার অর্থ আমি এটুকুই বুঝি। তাই আমরা, এদেশের মানুষেরা মানুষের পুনর্নবীকরণে গভীর আস্থা রাখি। অধঃপতিত এবং আপাতদৃষ্টিতে অপদার্থ মানুষদের সুযোগ দিলে তারা যে বড় বড় সংগঠনমূলক কাজ করতে পারে এ বিশ্বাস আমরা রাখি; আমাদের বিশ্বাস অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক, কোনো আদর্শগত তত্ত্ব এর ভিত্তি নয়। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, প্রজননশাস্ত্রবিদ্ যাই বলুন না কেন, এ বিশ্বাস আমাদের অব্যাহত থাকবে যে, মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতো তাদের অতীতের হাতে বন্দী নয়। তাদের পূর্বপুরুষের ধারা এবং তাদের পরিবেশ পরিপূর্ণ ভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে না; কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধনের তার সীমাহীন শক্তি আছে এবং কখনই পরিপূর্ণরূপে এ দুটি শক্তির অবক্ষয় ঘটে না।